সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার নতুন ই-মেল আইডি

sangramihatiar@gmail.com

পত্রিকা সংক্রান্ত বিষয়বস্তু এই মেল আইডি-তে পাঠানোর জন্য সকলকে অনুরোধ করা হচ্ছে।

সংগ্রামী হাতিয়ার

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র

জন্ম শতবর্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য

নেলসন ম্যান্ডেলা

জুলাই'১৮ ■ ৪৭তম বর্ষ ■ তৃতীয় সংখ্যা ■ মূল্য দু'টাকা

রাজ্য কাউন্সিলের আহ্বান

হার না মানা লড়াইয়ের প্রস্তুতি শুরু হোক

উদারনীতির দাপটে শ্রমিক কর্মচারী শ্রমজীবী মানুষের জীবন জীবিকা আজ আক্রান্ত। দেশের অভ্যন্তরে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের ঘৃণ্য রাজনীতি ভয়ঙ্কর রূপ নিচ্ছে। আমাদের রাজ্যে সম্প্রতি রাজনৈতিক সংগ্রামে সর্বস্তরের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে ধ্বংস করা হয়েছে, শুধু তাই নয়, এক কথায় গণতন্ত্রকে সমাধিস্থ করা হয়েছে। এছাড়া আমাদের রাজ্যে বহুমাত্রিক সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের রাজনীতির বিরুদ্ধে, ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার রক্ষা, পাহাড় প্রমাণ আর্থিক বঞ্চনা ও প্রতারণার প্রতিবাদে বলিষ্ঠতার সাথে আত্মবিশ্বাস নিয়েই আগামী দিনে কর্মচারী সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে বৃহত্তর সংগ্রামে শামিল হওয়ার লক্ষ্যে সর্বত্র প্রস্তুতি নিতে হবে।

বিশ্বজিৎ গুপ্তচৌধুরী

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির রাজ্য কাউন্সিলের পঞ্চম সভা বিগত ২৮-২৯ জুলাই ২০১৮ কর্মচারী ভবনের অরবিন্দ সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভা পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি অসিত কুমার ভট্টাচার্য ও সহ-সভাপতিত্রয় সুনির্মল রায়, গীতা দে এবং প্রশান্ত সাহাকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষে অসিত কুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক শোকপ্রস্তাব উত্থাপন ও নীরবতা পালনের পরবর্তীতে প্রারম্ভিক বক্তব্যে সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিংহ বলেন ২০০৮-এর পরবর্তীতে গোটা বিশ্বেই চরম দক্ষিণপন্থী শক্তির উদ্ভব ঘটছে। জনমোহিনী শ্লোগানকে সামনে রেখে ক্ষমতা দখল করলেও, আর্থিক সংস্কারের নামে পশ্চিমী

বিজয় শংকর সিংহ

দেশগুলিতে পেনশন ব্যবস্থা এবং শ্রমিকের মজুরি ছাঁটাই-এর খাঁড়া নামিয়ে আনা হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে দেশে দেশে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে মানুষ পথে নামছেন, লড়াই সংগ্রামে শামিল হচ্ছেন। আমাদের দেশেও ২০১৪ পরবর্তীতে দেশের সরকার নয়া উদার আর্থিক নীতিকে বেপরোয়াভাবে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে লাগু করতে চাইছে। এর বিরুদ্ধে বামপন্থীদের নেতৃত্বে দেশের শ্রমিকশ্রেণী ঐক্যবদ্ধ লড়াই আন্দোলনে শামিল হচ্ছে। কৃষকমারা অর্থনীতির বিরুদ্ধে দেশের কৃষকসমাজ বামপন্থীদের নেতৃত্বে লড়াইতে শামিল হচ্ছেন, মহারাষ্ট্রে ঐতিহাসিক লঙ মার্চে প্রতিরোধের বার্তা পেয়েছেন দেশের শাসকশ্রেণী। আগামী ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮

ষষ্ঠ পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে

কেরালায় অভূতপূর্ব বন্যায় অসহায় দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ান

বেনজির প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করতে কেরালার অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে সারা রাজ্য জুড়ে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের কাছে 20/- (কুড়ি) টাকার একাধিক কুপন সংগ্রহ করার মানবিক আবেদন জানাচ্ছি। পাশাপাশি নজিরবিহীন ভয়ঙ্কর বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় অসহায় মানুষের পাশে থেকে অতীতের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার অনুরোধ করছি।

বিজয় শংকর সিংহ

সাধারণ সম্পাদক

১১ আগস্ট, ২০১৮

কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর আত্মবলিদান দিবসে ১১ আগস্ট, ২০১৮ মৌলালী যুব কেন্দ্রে কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই সংক্ষিপ্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংগঠনের সভাপতি অসিত কুমার ভট্টাচার্য্য। উদ্বোধনী

বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ। তিনি অনুষ্ঠানের প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করে অপেক্ষমান আন্দোলন সংগ্রামে কর্মচারীদের আরও বেশি দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান। কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক উপসমিতির আহ্বায়ক আশীষ ভট্টাচার্য আগস্ট মাসব্যাপী শ্রমজীবী দেশপ্রেমিক মানুষের আন্দোলন সংগ্রামের ঐতিহাসিক পটভূমি ব্যাখ্যা করেন এবং সাংস্কৃতিক জগতের পথিকৃতদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন।

এই অনুষ্ঠানে ২০১৭ সালে অনুষ্ঠিত 'ভারতে মৌলবাদের স্বরূপ ও উত্তরণের পথ' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এই প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় ১৮ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেছিলেন। বিচারক হিসেবে ছিলেন বেলুড় কলেজের অধ্যাপক গৌতম রায়, সংগঠনের সভাপতি অসিত কুমার ভট্টাচার্য, সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার সম্পাদক সুমিত ভট্টাচার্য, সংগঠনের প্রাক্তন সভাপতি অশোক পাত্র। প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছেন কৃষি কারিগরি কর্মীসংস্থার যুগ্ম সম্পাদক রুদ্রকান্ত ভট্টাচার্য, দ্বিতীয় হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ গ্রুপ-ডি সরকারী কর্মচারী সমিতির বাঁকুড়া জেলার সদস্য তপন চক্রবর্তী এবং তৃতীয় হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ সেটেলমেন্ট কর্মচারী সমিতির জলপাইগুড়ি জেলার সদস্য রাজদীপ দত্ত।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের

শুরুতেই সঙ্গীতালেখ্য পরিবেশন করেন কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক শাখার কর্মীবৃন্দ। রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুলগীতি, সুকান্ত ভট্টাচার্যর কবিতা অবলম্বনে গান এবং শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর আত্মবলিদান দিবস উপলক্ষে 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি' সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন শান্তনু ভট্টাচার্য, এছাড়া কবিতা আবৃত্তি করেন বাণী মিশ্র, মায়া মুখার্জি, রনিয়া রায় এবং প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গীতালেখ্য পরিবেশন করেন সুপ্রীয় ব্যানার্জীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক টীম। সন্দীপ দত্তর পরিচালনায় শ্রুতি নাটক 'কি গেরো' পরিবেশিত হয়। দীপক নস্করের পরিচালনায় সময়োপযোগী নাটক 'কারা মোর ঘর ভেঙেছে' পরিবেশিত হয়। নৃত্যালেখ্য 'তিমির বিনাসিনী' পরিবেশিত হয় সুপ্রীয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায়। সামগ্রিকভাবে অত্যন্ত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক কর্মসূচী উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীকে আপ্লুত করেছে। উদ্বুদ্ধ করেছে অপেক্ষমান আন্দোলন সংগ্রামে আরও বেশি আত্মনিয়োগ করার। □

অষ্টম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদান, ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশ দ্রুত প্রকাশ ও কার্যকরী করা সহ পাঁচ দফা দাবিতে —

৩০ আগস্ট ২০১৮, অফিস ছুটির পর

কলকাতায় কেন্দ্রীয় মহামিছিল

ধর্মতলার লেনিন মুর্তির পাদদেশ থেকে
শিয়ালদহ বিগবাজার পর্যন্ত
ঐ একই দিনে প্রতিটি জেলা সদরে মিছিল

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতিসমূহের

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

প্রথম রাজ্য মহিলা

কনভেনশন

৮-৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৮

কর্মচারী ভবন

অরবিন্দ সভাকক্ষ

১০-এ শাঁখারিটোলা স্ট্রিট,

কলকাতা-৭০০০১৪

৯ আগস্ট, ২০১৮

কৃষক-শ্রমিকদের দেশব্যাপী জেল ভরো আন্দোলন

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সূচনা হয়ছিল ৯ আগস্ট ১৯৪২। ২০১৮ সালে ৯ আগস্ট ঐ দিনটিকে স্মরণে রেখেই দেশজুড়ে আন্দোলনে উত্তাল হলেন কৃষক-শ্রমিকরা। কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির কারণে ভয়াবহ সংকটে বিপর্যস্ত কৃষি এবং কৃষকের সমস্যা অবিলম্বে সমাধানের দাবিতে দেশজুড়ে উত্তাল 'জেল ভরো' আন্দোলনে শামিল হওয়া লক্ষ লক্ষ কৃষককে ৯ আগস্ট গ্রেপ্তার করলো সরকার। গত কয়েকমাসের টানা প্রচার অভিযানের পর ঐদিন সারা দেশে 'জেল ভরো' আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল সারাভারত কৃষক সভা। কৃষকদের এই লড়াইয়ে প্রত্যক্ষ সমর্থন জানিয়েছিল শ্রমিক, মহিলা, ছাত্র, যুবসহ বিভিন্ন গণ সংগঠন ও

ষষ্ঠ পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে

সম্পাদকীয়

এক দেশ, দুই রাজ্য, এক লক্ষ্য

গত ১৩ জুলাই, ২০১৮, পশ্চিমবঙ্গের আলিপুরদুয়ার জেলার কুমার গ্রাম ব্লকের কামাক্ষাগুড়িতে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির দপ্তর বলপূর্বক দখল করলো, রাজ্যের শাসকদলের যুব শাখার গুণ্ডা বাহিনী। এই ঘটনার ঠিক এক মাস পরে, গত ১৩ আগস্ট ২০১৮ ত্রিপুরা রাজ্যের ধর্মনগর সাব-ডিভিসনে ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটি (এইচ বি রোড)-এর দপ্তর একইভাবে বলপূর্বক দখল করলো ঐ রাজ্যের শাসকদলের গুণ্ডাবাহিনী। ঠিক এক মাসের ব্যবধানে ঘটনা এই দুটি ঘটনার (কর্মচারীদের অর্থে নির্মিত দপ্তর দখল করছে শাসকদলের গুণ্ডাবাহিনী) আপাতদৃষ্টিতে কোনো যোগসূত্র না থাকলেও, একটু গভীর মনোনিবেশ করলেই শুধু যোগসূত্র নয়, একটা গূঢ় সম্পর্কও ধরা পড়ে যাবে। তবে সেই প্রসঙ্গে আলোকপাত করার আগে, এটা বলে নেওয়া ভালো যে, যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেওয়া হয়, কামাক্ষাগুড়ি ও ধর্মনগরের দুটি ঘটনার মধ্যে কোনো সম্পর্কই নেই, তবুও একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, পৃথক পৃথকভাবে বিবেচনা করলে দেখা যাবে, অধুনা পশ্চিমবাংলার ঘটমান বর্তমানে কামাক্ষাগুড়ি যেমন কোনো ব্যতিক্রমী বিষয় নয়, তেমনই ত্রিপুরা রাজ্যের ঘটমান বর্তমানেও ধর্মনগর কোনো ব্যতিক্রমী ঘটনা নয়। প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন একথা বলা হচ্ছে? একথা বলার কারণই হলো, ২০১১ সালে পশ্চিমবাংলার বর্তমান শাসকদল যখন প্রথমবার ক্ষমতার মসনদে বসার সুযোগ পায়, ঠিক তার কয়েকদিনের মধ্যেই তারা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিরোধী রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন ও গণসংগঠনের দপ্তর জবরদখল করা শুরু করে। এই জবরদখলের তালিকায় শুরু থেকেই রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নাম ছিল। ঠিক একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে ত্রিপুরাতেও। সেখানেও ২০১৭ সালের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে নতুন শাসকদল আত্মপ্রকাশ করার পরেই, বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন ও গণসংগঠনের দপ্তর জবরদখল অভিযান শুরু হয়। বলা বাহুল্য এক্ষেত্রেও জবরদখলের তালিকায় শুরু থেকেই ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটির (এইচ বি রোড)-এর নাম ছিল। পরিবর্তন-উত্তর পশ্চিমবাংলায় যেমন কামাক্ষাগুড়ি কোনো বিচ্ছিন্ন বা প্রথম ঘটনা নয়। ঠিক তেমনই পরিবর্তন-উত্তর ত্রিপুরাতেও ধর্মনগর কোনো বিচ্ছিন্ন বা প্রথম ঘটনা নয়। ২০১১ পরবর্তী পশ্চিমবাংলায় যেমন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির বহু দপ্তর গায়ের জোরে দখল করা হয়েছে, ভাঙচুর করা হয়েছে, আগুন লাগিয়ে পুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঠিক তেমনই ২০১৭ পরবর্তী ত্রিপুরাতে কর্মচারী সমন্বয় কমিটি (এইচ বি রোড)-এর বহু দপ্তর গায়ের জোরে দখল করা, ভাঙচুর করা, আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। দুই রাজ্যের বামপন্থায় বিশ্বাসী দুটি সর্ববৃহৎ কর্মচারী সংগঠনের দপ্তরগুলির ওপর সংগঠিত ধারাবাহিক আক্রমণগুলির উপরোক্ত চারিত্রিক সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করলে, খুব স্বাভাবিকভাবেই মনের কোণে একটা প্রশ্ন উঁকি মারে, এবং যা শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে—তা হল এই দুইয়ের মধ্যে কোনো যোগসূত্র কি রয়েছে?

কেউ কেউ, বিশেষ করে তারা, যারা ভোরের সূর্যোদয়ের সাথে সাথেই সারা দুনিয়ার খবরের পসরা নিয়ে আমাদের দোরগোড়ায় হাজির হয়, যারা পার্থিব কোনো কিছুকেই নাকি ভয় পায় না, যাদের সাথে প্রতিদিন মোলাকাত না হলে না কি পিছিয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে, সেই তারা সমস্বরে বলে উঠবে না না, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবাংলার ঘটনার মধ্যে কোনো যোগসূত্র থাকতেই পারে না। থাকতে পারে না কারণ, দুই রাজ্যের শাসকদল ভিন্ন। তাদের নাম ভিন্ন, ঝাণ্ডার রং ভিন্ন, নেতা-নেত্রী ভিন্ন। কী করে যোগসূত্র থাকবে? তাছাড়া ত্রিপুরায় যারা শাসকদল, তারা তো পশ্চিমবাংলায় বিরোধী দল। থুড়ি, প্রধান বিরোধী দল। দ্যাখেন না, প্রতিদিন কেমন বিবৃতির তরজা চলছে। একে অপরের বিরুদ্ধে কেমন রণংদেহী ভঙ্গীমায় ভাষণ দেয়। তাছাড়া এ রাজ্যের শাসকদল দেখছেন না কেমন দিল্লীর মসনদ দখলের জন্য উদ্গ্রীব হয়ে উঠেছে। তর সইছে না। মনে হচ্ছে, লোকসভা নির্বাচনটা ২০১৯-এ না হয়ে এই বছরেই হয়ে গেলে ভালো হয়। আর দিল্লী দখল যখন শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা, তখন এ রাজ্যের শূন্য সিংহাসনে কে বসছেন তাও ঠিক হয়ে আছে। শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক 'অভিষেক'টাই বাকি। এই যে দিল্লী দখলের এত তোড়জোড়, সেটা সফল করতে হলে কাদের দিল্লীর মসনদ থেকে সরাতে হবে? জানেন না? যারা ত্রিপুরায়ও ক্ষমতায় আছে তাদের। অর্থাৎ ত্রিপুরায় যারা ক্ষমতায়, আর পশ্চিমবাংলায় যারা ক্ষমতায়, তাদের মধ্যে যোগসূত্র খোঁজার কোনো মানেই হয় না।

এতো গেল তাদের যুক্তি, যারা সাধারণ মানুষকে তাদের তৈরি করা রঙীন কাঁচের চশমা দিয়ে দুনিয়াটাকে দেখাতে চায়। কিন্তু ওদের শত চেষ্টা সত্ত্বেও, সব মানুষ তো আর রঙীন চশমা পরে দুনিয়াটাকে, দেশটাকে, রাজ্যটাকে দ্যাখেন না। খালি চোখেই দুনিয়াটাকে দেখতে ভালোবাসেন। তারা কিন্তু পশ্চিমবাংলা ও ত্রিপুরার শাসকদলের উপরোক্ত পার্থক্য নিরূপণের চেষ্টাকে যুক্তি না বলে বাহানা বলেই মনে করেন। এদের পাল্টা যুক্তি হলো, রাজনীতির প্রাঙ্গণে বিরোধিতা মানে তো একে অপরের নীতি, কর্মসূচী ও ভূমিকার যুক্তিগ্রাহ্য বিরোধিতা ও বিকল্পের উপস্থাপনা। শুধুমাত্র গরম গরম বিবৃতিকেই কি বিরোধিতা বলে ধরা যায়? এ কেমন বিরোধিতা যেখানে এক দল আরেক দলের হাতে গরম দুর্নীতি (সারদা, নারদা) নিয়ে প্রথম কয়েকদিন লম্ফ-ঝম্প করেই চেপে যায়। অথবা সংসদে কোনো একটি বিলের উপর ভোটাভুটির সময়, একদল গরহাজির থেকে অথবা ওয়াকআউট করে আরেক দলের সুবিধা করে দেয়। ফলে ত্রিপুরা ও পশ্চিমবাংলার দুই শাসকদল আলাদা নাম ও প্রতীক চিহ্ন নিয়ে সংসদীয় রাজনীতির পরিভাষায় নিজেদের পরস্পরের বিরোধী বলে জাহির করতেই পারে। কিন্তু মানুষের জীবন-জীবিকার সম্পৃক্ত যে রাজনৈতিক তুলাদণ্ড, তার নিরিখে এদের আদৌ বিরোধী দল বলা যায় না।

বলা যে যায় না, তার জ্বলন্ত উদাহরণ আজকের পশ্চিমবাংলা ও ত্রিপুরা। ফোলানো, ফাঁপানো প্রচার নয়, সাধারণ মানুষের (ওদের পরিভাষায় আম-জনতা) দৈনন্দিন জীবন-জীবিকার অভিজ্ঞতায় সঞ্জাত দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই কামাক্ষাগুড়ি ও ধর্মনগর, বা দুটি রাজ্যেই প্রায় প্রতিদিন ঘটে যাওয়া এমন অসংখ্য ঘটনার যোগসূত্রটি খুঁজে পাওয়া যাবে। আমরা এখন এরা আর ওরা বিরোধী কি বিরোধী নয়, সেই বিতর্ক থেকে সরে এসে, ঐ যোগসূত্র নির্ণয়ে মনোনিবেশ করতে পারি। কেন তা জরুরী তা না হয়, শেষেই বলা যাবে। কিন্তু সাঁতার না জানলে যেমন ডুবুরি হওয়া যায় না, তেমনই দুই রাজ্যের অতীত ও সাম্প্রতিক অতীতের সাদৃশ্যগুলি না জানলে যোগসূত্র খুঁজে পাওয়াও সম্ভব নয়। দুটি রাজ্যই বাম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের (রাজ্য কর্মচারীদের আন্দোলনসহ) একেবারে ভ্রূণাবস্থা থেকে ক্রমান্বয়ে বিকাশ ও প্রসারের সাক্ষী। দুটি রাজ্যেই বাম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ঘনীভূত রূপ বামফ্রন্টের আত্মপ্রকাশ এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের তরঙ্গ শীর্ষে বামফ্রন্টের সরকার গঠন। দুটি রাজ্যেই দীর্ঘ তিন দশকের কিছু কম ও বেশি সময় ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে বামফ্রন্টের সরকার পরিচালনা এবং সেই সরকারগুলির কর্মসূচী রূপায়ণের মাধ্যমে গণতন্ত্রের সুপ্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্র ব্যবস্থার অঙ্গ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গণতান্ত্রিক পরিচালনা পদ্ধতি সুনিশ্চিত করা, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, জনমুখী কর্মসূচী রূপায়ণ, নারী, ধর্মীয় সংখ্যালঘুসহ সমাজের পশ্চাদ্‌পদ অংশের ক্ষমতায়নের বিশেষ উদ্যোগ, ধর্ম-বর্ণ-জাতপাত নির্বিশেষে ঐক্য ও সম্প্রীতির আদর্শ পরিবেশ সৃষ্টি প্রভৃতি বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়েছে। এই দুই বামফ্রন্ট সরকারের উল্লিখিত একগুচ্ছ কর্মসূচীর সফল রূপায়নের ফলে, দুটি রাজ্যেই একদিকে যেমন জনসাধারণের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটেছে, তেমনই অপরদিকে প্রসারিত হয়েছে জনচেতনা, অধিকারবোধ, কুসংস্কার মুক্ত বিজ্ঞান নির্ভর দৃষ্টিভঙ্গী এবং ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাব। যেগুলি সামগ্রিকতায় প্রকৃত মানব উন্নয়ন সূচক (অমর্ত্য সেন-জাঁ দ্রেজ বর্ণিত)-এর দ্যোতক। যা প্রকৃত প্রস্তাবে জি ডি পি-র হ্রাস-বৃদ্ধি নির্ভর 'উন্নয়ন মডেল'-এর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক চরিত্রের এক পূর্ণ বিকল্প ভাবনা। সর্বোপরি দুটি রাজ্যই শোষণমূলক শ্রেণীবিভক্ত সমাজ ব্যবস্থা থেকে শোষণহীন উন্নততর ব্যবস্থায় উত্তরণের পথ নিরূপণের গুরুত্বপূর্ণ চর্চা কেন্দ্র।

পশ্চিমবাংলা ও ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার খুব সহজ ও স্বাভাবিক পদ্ধতিতে তাদের কর্মসূচী রূপায়ণ করতে পারেনি। কিন্তু তারা যে দেশের সংবিধানের বাইরে গিয়ে কোনো কাজ করতে চেয়েছে তা কিন্তু নয়। তা সম্ভবও নয়, অঙ্গরাজ্যের সরকারের পক্ষে। তবু পদে পদে বাধা এসেছে। কারণ ভারতরাষ্ট্রের মূল ক্ষমতার চাবি কাঠি যাদের হাতে স্বাধীনতা প্রাপ্তির লগ্ন থেকেই রয়েছে, সেই জমিদার-জোতদার ও বৃহৎ পুঁজিপতিরা কখনোই চায় নি, সংবিধানের প্রতিটি পৃষ্ঠায় সংবিধান প্রণেতাদের যে আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটেছে তা সঠিক অর্থে বাস্তবায়িত হোক। তারা চেয়েছে, তাদের প্রতিনিধি হয়ে যারা ভারত রাষ্ট্রটিকে পরিচালনা করবে, তারা সংবিধানের বিভিন্ন ধারা-উপধারা মেনে চলতে বাধ্য থাকলেও, কখনোই যেন সংবিধানের অন্তর্নিহিত স্পিরিটটিকে অনুসরণ না করে। অথচ দুটি রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার চেয়েছে, সীমিত ক্ষমতার মধ্যে যতটুকু সম্ভব সংবিধানের মূল স্পিরিটটাকে অনুসরণ করতে। ফলে শুরু থেকেই দ্বন্দ্ব বেধেছে এখানেই। রাষ্ট্রের শাসক শ্রেণী প্রথম দিকে এই ধরনের সরকারগুলিকে পূর্ণ সময় কাজ করতে না দিয়ে ভেঙে দিয়েছে। কিন্তু তাতে ফল হয়েছে বিপরীত। আরও বেশি জনসমর্থন নিয়ে পুনরায় ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। ফলে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শাসকশ্রেণীও তাদের কৌশল পরিবর্তন করেছে। শুরু হয়েছিল বঞ্চনা ও অসহযোগিতার কৌশল। এই ভাবেই জনকল্যাণকামী রাষ্ট্র জনকল্যাণের মুখোশ পরে, প্রকৃত জনকল্যাণের কাজ করছে যে সরকারগুলি তাদের সামনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। বৈষম্যমূলক ও বিমাতৃসুলভ আচরণের এই পর্ব চলেছে নয়া উদারবাদী অর্থনীতির যাত্রা শুরু হওয়ায় প্রাক্-মুহূর্ত পর্যন্ত। কিন্তু এই পর্বে বাম সরকারগুলি যাতে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে না পারে, তার জন্য শাসকশ্রেণী কেন্দ্রের মাধ্যমে বঞ্চনা ও অসহযোগিতার কর্মসূচী গ্রহণ করলেও, আদর্শগত বিরোধিতার জায়গায় যায়নি। কারণ কার্যক্ষেত্রে না হলেও, অন্তত আনুষ্ঠানিকভাবে জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রের ভূমিকা ও বাম সরকারগুলির কর্মসূচীর কোনো আদর্শগত বিরোধী ছিল না। কিন্তু পরিপ্রেক্ষিতটির পরিবর্তন ঘটে উদারবাদী পর্বে। আদর্শগত বিরোধের ক্ষেত্র প্রস্তুত নয়। কারণ বাম সরকারের কর্মসূচী ও নয়া উদারবাদী কর্মসূচীর অবস্থান বিপরীত মেরুতে। ফলে আক্রমণ শুধুমাত্র বামসরকারগুলির ওপর কেন্দ্রীভূত না থেকে, সমগ্র বাম মতাদর্শের ওপরই আক্রমণ শুরু হয়।

শাসক শ্রেণী জানে সময়ের সাথে সাথে এই আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। কারণ নয়া উদারবাদী অর্থনীতির ধাক্কায় মানুষের জীবন-জীবিকা ক্রমান্বয়ে সঙ্কটাপন্ন হলে, মানুষ বাঁচার তাগিদে বিকল্পের সন্ধান করবেন। আর নয়াউদারবাদের বিকল্পের খোঁজ তো বামপন্থীরাই দিতে পারেন। তাই সতর্ক না হলে মানুষের আরো বেশি বেশি করে বামপন্থার দিকে ঝুঁকে পড়াই স্বাভাবিক। ফলে মানুষের বাম অভিমুখী ঝোঁক আটকাতে দ্বি-মুখী কৌশল অবলম্বন করা প্রয়োজন---(১) বাম আন্দোলনের মূল কেন্দ্রগুলিকে টার্গেট করা, এবং (২) আদর্শগত আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধির জন্য বামবিরোধী সব থেকে প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক শক্তিগুলিকে ব্যবহার করা। এই কাজটা সহজ হয় যদি প্রশাসনকে ব্যবহার করে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি একটা ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করতে পারে। দপ্তর জবরদখল, শারীরিক আক্রমণ ইত্যাদি সেই ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করারই কৌশল। একদিকে বামপন্থাকে অপ্রাসঙ্গিক বলে প্রচার, অপরদিকে ভীতি-প্রদর্শন—এই দুই হলো অস্ত্র যেগুলিকে ব্যবহার করছে এ দেশের সব থেকে প্রতিক্রিয়াশীল দুটি রাজনৈতিক শক্তি, তাদের প্রশাসনিক ক্ষমতাকে ব্যবহার করে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায়। ফলে কামাক্ষাগুড়ি ও ধর্মনগরের ঘটনা বা দুটি রাজ্যেই প্রতিনিয়ত ঘটে যাওয়া এই ধরনের অসংখ্য ঘটনা, একই পরিকল্পনার দুটি পৃথক অংশ মাত্র। যোগসূত্রটা বুঝতে অসুবিধা হয় কি? □

২৩ আগস্ট, ২০১৮

প্রয়াত সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়

চলে গেলেন লোকসভার প্রাক্তন স্পিকার সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়। গত ১৩ আগস্ট, সোমবার সকাল সোয়া আটটা নাগাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর।

কয়েকদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়। তাঁকে ভর্তি করা হয় কলকাতার একটি বেসরকারী হাসপাতালে। ক্রমান্বয়ে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে। ১২ আগস্ট রবিবার তাঁর অবস্থা সংকটজনক হয়ে পড়ে। শ্বাসকষ্টসহ অন্যান্য সমস্যার জন্য তাঁকে ভেন্টিলেশনে দেওয়া হয়। ডায়ালিসিসও করতে হয়। কিন্তু শেষরক্ষা হলো না। চিকিৎসার ধকল তিনি নিতে পারলেন না। টানা ৪০ দিন হাসপাতালে ভর্তি থাকার পর গত ১ আগস্টই তিনি বাড়ি ফিরেছিলেন। ৫ আগস্ট ফের অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে ভর্তি করা হয় কলকাতার ঐ বেসরকারী হাসপাতালে। ১৩ আগস্ট সকালে তিনি ফের হৃদরোগে আক্রান্ত হন।

সোমনাথ ছিলেন একদিকে দুঁদে ব্যারিস্টার, অন্যদিকে সমীহ আদায় করা বিরল ঘরানার রাজনীতিক ও অধিবেশন কাঁপানো সাংসদ। ২০০৪-২০০৯ সাল পর্যন্ত লোকসভার স্পিকার ছিলেন তিনি। সংসদীয় প্রতিষ্ঠানকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন এই প্রবীণ সাংসদ। এহেন এক ব্যক্তির প্রয়াণে শোকস্তব্ধ সংসদের করিডর থেকে রাজনৈতিক মহল আর দলমত নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ তো বটেই।

রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, বামপন্থী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দসহ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন দেশের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। আপ প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল তাঁকে দেশের সেরা লোকসভা স্পিকার বলে বর্ণনা করেছেন।

১৯৭১ সালে তিনি সংসদীয় রাজনীতিতে পা দেন। বর্ধমান লোকসভা কেন্দ্রে জয়ী হয়েছিলেন তিনি। ১৯৭৩ সালে সিপিআই(এম)-এ যোগদান করেন। দশবার সাংসদ ছিলেন। এরমধ্যে ১৯৮৪ সালে একবারই যাদবপুর কেন্দ্রে মমতার কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। তারপর দল তাকে বোলপুর কেন্দ্রে মনোনিত করে প্রার্থী হিসাবে। সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের শিক্ষাজীবন ছিলো উজ্জ্বলতায় মোড়া। স্কুল জীবন মিত্র ইন্সটিটিউশন, তারপর প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, তারপর লন্ডনের কেমব্রিজ থেকে আইনে উচ্চ ডিগ্রী লাভ। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেছেন স্ত্রী এবং এক পুত্র ও এক কন্যাসহ অসংখ্য গুণমুগ্ধ সহযোদ্ধা ও পরিজনকে। □

অটল বিহারী বাজপেয়ীর জীবনাবসান

প্রয়াত হলেন দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। তিনি ছিলেন স্বাধীন ভারতের দশম প্রধানমন্ত্রী। গত ১৬ আগস্ট বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা ৫ মিনিটে দিল্লীর এইমস-এ তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তাঁর জন্ম গোয়ালিয়র শহরে। বাবা স্কুল শিক্ষক কৃষ্ণবিহারী কবি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তরুণ বয়সে তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় আর্য সমাজের হাত ধরে। সংগঠনের যুব শাখা আর্য কুমার সভায় যোগ দেন তিনি। ১৯৪৪ সালে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হন। এর পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা বাড়ছিল তাঁর। বাবাসাহেব আপ্তের হাত ধরে ১৯৩৯-এ স্বয়ং সেবক হিসেবে যোগ দেন আর এস এস-এ। ১৯৪৭ সালে পূর্ণসময়ের কর্মী হিসেবে যোগ দেন আর এস এসে। এর মধ্যেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। দীনদয়াল উপাধ্যায়ের রাষ্ট্রধর্ম পত্রিকায় কাজ শুরু করেন। একই সঙ্গে লেখালিখি চলতে থাকে

পাঞ্চজন্য-সহ অন্য পত্রিকাগুলিতেও। নাথুরাম গডসের হাতে গান্ধীর হত্যার পর দেশজুড়ে নিষিদ্ধ করা হয় আরএসএস-কে। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জনসঙ্ঘে যোগ দেন বাজপেয়ী। ১৯৫৭ সালে দ্বিতীয় লোকসভা ভোটে বলরামপুরে জয়ী হন বাজপেয়ী।

দীনদয়াল উপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর জনসঙ্ঘের দায়িত্ব নেন অটলবিহারী বাজপেয়ী। সঙ্গে ছিলেন লালকৃষ্ণ আদবানি। ১৯৭৫-এ জরুরি অবস্থার সময়ে অন্য বিরোধী নেতাদের সঙ্গে গ্রেপ্তার হন বাজপেয়ী। জয়প্রকাশ নারায়ণের ডাকে সাড়া দিয়ে কংগ্রেস বিরোধী জনতা পার্টিতে যোগ দেয় জনসঙ্ঘও। ১৯৭৭-এর ভোটে ক্ষমতায় আসে জনতা পার্টি। মোরারজি দেশাইয়ের মন্ত্রিসভায় বিদেশমন্ত্রী হন বাজপেয়ী। সেই সরকার বেশিদিন চলেনি। এরপর জনসঙ্ঘ থেকে তৈরি হলো নতুন দল ভারতীয় জনতা পার্টি। বাজপেয়ীকে মুখ করে ১৯৯৬-এর ভোট লড়ে বিজেপি। ১৯৯৬ সালে প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী হন অটলবিহারী বাজপেয়ী। তবে আস্থা ভোটে হেরে ১৩ দিনেই ইতি পড়ে সেই সরকারের। এরপর ইউনাইটেড ফ্রন্ট সরকারও বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ১৯৯৮ সালে বেশ কিছু আঞ্চলিক দল নিয়ে এনডিএ জোট তৈরি করে বিজেপি।

১৯৯৯-এর মে মাসে হঠাৎই জোট ছেড়ে দেন জয়ললিতা। ১৩ মাসের মাথায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায় বাজপেয়ী সরকার। অন্যদিকে কাশ্মীর সীমান্তে অনুপ্রবেশ। শুরু হয়ে যায় কার্গিলের যুদ্ধ। সেই যুদ্ধ জয়ের পর বিপুল ভোটে জিতে ক্ষমতায় আসে এনডিএ।

▶▶ *তৃতীয় পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে*

ব্যাক টু মার্কস

সুমিত ভট্টাচার্য

এই বছর ৫ মে ২০০ বছর পূর্ণ করে ২০১ বছরে পা দিলেন কার্ল মার্কস। তাঁর দ্বি-শততম জন্মবার্ষিকীকে কেন্দ্র করে সারা বিশ্বজুড়েই নতুন করে 'মার্কস' ও 'মার্কসবাদ'কে নিয়ে চর্চার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। এই প্রসঙ্গে যা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য তা হলো, দ্বি-শত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিশ্বব্যাপী মার্কস চর্চায়, তাঁর তত্ত্বকে আক্রমণ করার পরিবর্তে তত্ত্বের গভীরে প্রবেশ করে এর অন্তর্নিহিত গুণাবলী অনুসন্ধান করার ঝোঁকটাই যেন বেশি। অথচ কিছুদিন আগে পর্যন্ত পরিস্থিতিটা কিন্তু এরকম ছিল না। গত শতাব্দীর নব্বই-এর দশকের একেবারে গোড়ায় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপর্যয়ের পর, মার্কসবাদের মৃত্যুঘণ্টা বাজিয়ে 'ইতিহাসের অবসান' (এন্ড অফ হিস্ট্রি) তত্ত্ব হাজির করা হয়েছিল। সোল্লাসে ঘোষণা করা হয়েছিল মার্কসবাদ ভ্রান্ত। ইতিহাসের গতিপথে মার্কসবাদের নাকি আর কোনো প্রাসঙ্গিকতা নেই। ইউরোপসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যেও আনুষ্ঠানিকভাবে মার্কসবাদকে পরিত্যাগ করে, সোশ্যাল ডেমোক্রেসির পথ অনুসরণ করার ঝোঁক শুরু হয়ে গিয়েছিল সেই সময়েই। অথচ মাত্র দু'দশক কাটতে না কাটতেই, সেই সোৎসাহ চিল চিৎকার মৃদু থেকে মৃদুতর হতে শুরু করলো। যে সমস্ত দেশে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির দপ্তরে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে মার্কসকে 'আলবিদা' করা হয়েছিল, সেখানেও মানুষ আবার নতুন করে মার্কসকে সামনে রেখে লালঝাণ্ডার নীচে সমবেত হতে শুরু করলেন। এমনকি 'ইতিহাসের অবসান' তত্ত্বের রচয়িতা ফ্রান্সিস ফুকুয়ামাও ঢোঁক গিলে তাঁর নিজের তত্ত্বের বিরুদ্ধেই প্রশ্ন খাড়া করতে শুরু করলেন। কেন? কি এমন ঘটলো যে ভ্যাটিক্যান সিটির পোপও 'ওল্ড টেস্টামেন্ট' ছেড়ে 'দাস ক্যাপিটাল'-এ মনোনিবেশ করতে শুরু করলেন?

এইসব অভূতপূর্ব বিপরীত প্রতিক্রিয়ার কারণই হলো, ২০০৮ সাল থেকে পুঁজিবাদ আবারও এক দীর্ঘস্থায়ী মহামন্দার কবলে পড়ল। যা থেকে এক দশক পরে আজও পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেনি। পুঁজিবাদী বিকাশের বিভিন্ন পর্বে এই দীর্ঘস্থায়ী সঙ্কট যে স্বাভাবিক পরিণতি সে তো কার্লমার্কসই বলে গিয়েছিলেন। মার্কসই তো বলেছিলেন পুঁজিবাদী ব্যবস্থা প্রায়শই চক্রাকারে কিছু সাধারণ সঙ্কটের সম্মুখীন হয়, যা থেকে সে বেরিয়ে আসতেও পারে ক্রমান্বয়ে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ঘটিয়ে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ধারাবাহিক অগ্রগতি একাজে তাকে সাহায্য করে। কিন্তু পর্যায়ক্রমিক সাধারণ সঙ্কটগুলির সাথে বোঝাপড়া করে সে তার অগ্রগতিকে টিকিয়ে রাখতে পারলেও, একটা সময় তাকে মহাসঙ্কটের মুখোমুখি হতে হয়। যা সামগ্রিক ব্যবস্থার ভিত্তিটাকেই দুর্বল করে দেয়। তখন আর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির টোটকায় শুধু কাজ হয় না।

গত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে এমনই এক মহামন্দায় আক্রান্ত হয়েছিল পুঁজিবাদ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে সৃষ্ট এই মহামন্দার হাত থেকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে রক্ষা করার জন্য এক নতুন দাওয়াইয়ের সন্ধান দিয়েছিলেন জন মেইনার্ড কেইনস্। তাঁর সেই দাওয়াই গলঃধকরণ করেই সে যাত্রায় রক্ষা পেয়েছিল পুঁজিবাদ। কিন্তু তা চিরস্থায়ী হয়নি। কেন হয়নি? কেন কেইনস্-এর তত্ত্ব পুঁজিবাদী সঙ্কটের স্থায়ী সমাধানের পথ দেখাতে পারেনি? না পারার কারণ কেইনস্-এর অদক্ষতা নয়। কারণটাও বলে গিয়েছিলেন কার্লমার্কসই। তিনি বলেছিলেন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সঙ্কটের কারণ নিহিত রয়েছে তার শোষণমূলক চরিত্রের মধ্যেই। তাই এই শোষণমূলক ব্যবস্থার উচ্ছেদ ব্যতিরেকে সঙ্কট থেকে চিরমুক্তির কোনো সম্ভাবনা নেই।

ইতিহাসের পরিহাস হলো এটাই যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উচ্ছেদ কল্পে রচিত মার্কসবাদকে ভ্রান্ত ঘোষণা করে যখন পুঁজিবাদী শিবিরে উল্লাস চলছে, ঠিক তখনই আবারও এক দীর্ঘস্থায়ী মহামন্দার কবলে পড়ল পুঁজিবাদ। অথচ আজকের সঙ্কটগ্রস্ত লগ্নীপুঁজির যে চরিত্র ও বৈশিষ্ট তা মার্কস দেখে যেতে পারেননি। মার্কস তাঁর জীবদ্দশায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে দেখেছিলেন শিল্প পুঁজির বিকাশ, ঔপনিবেশিক লুণ্ঠনের মাধ্যমে বিনিয়োগ যোগ্য পুঁজির আদিম সঞ্চয়, পণ্য উৎপাদনে সঞ্চিত পুঁজির বিনিয়োগ এবং তা থেকে উদ্বৃত্ত মূল্যের সৃষ্টি। উৎপাদিত পণ্যের বাজার দখলের জন্য পুঁজিবাদী দেশগুলির নিরন্তর রেষারেষিও তিনি দেখেছিলেন। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষ লগ্ন থেকে পণ্য রপ্তানির পরিবর্তে, সস্তা শ্রমের বিনিময়ে আরও বেশি মুনাফার তাগিদে উপনিবেশগুলিতে পুঁজি রপ্তানির যে প্রক্রিয়া শুরু হয়, তা তিনি দেখে যাননি। এই যে রপ্তানীকৃত পুঁজি, অর্থশাস্ত্রে যাকে বলা হয় 'লগ্নী পুঁজি' তার চরিত্র বিশ্লেষণ করেছিলেন লেনিন। যা ছিল মার্কসবাদী তত্ত্বের সাথে সময়োচিত সংযোজন। লেনিনের এই অবদানের কারণেই মার্কসবাদের সাথে লেনিনবাদ কথাটি যুক্ত হলো। কিন্তু মার্কস বা লেনিন কেউই আজকের লগ্নীপুঁজির চরিত্রকে দেখার বা বিশ্লেষণ করার সুযোগ পাননি। লেনিন মার্কসবাদী শিক্ষাকে আত্মস্থ করে, লগ্নীপুঁজির যে চরিত্র বিশ্লেষণ করেছিলেন, তার সাথে আজকের লগ্নীপুঁজির কতগুলি চরিত্রগত পার্থক্য রয়েছে। লেনিনের সমকালীন লগ্নীপুঁজির একটি জাতীয় চরিত্র ছিল। যেমন ব্রিটিশ পুঁজি, ফরাসী পুঁজি ইত্যাদি। কিন্তু আজকের লগ্নীপুঁজির কোনো জাতীয় চরিত্র নেই। ওয়ালমার্ট এদেশে যে পুঁজি বিনিয়োগ করে, তার মধ্যে কতটুকু মার্কিন পুঁজি বা ব্রিটিশ পুঁজি তা নির্ধারণ করা দুষ্কর। দ্বিতীয়ত, সেই সময় লগ্নীপুঁজির বিনিয়োগের ক্ষেত্র ছিল শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের উপনিবেশগুলি। ব্রিটিশ লগ্নীপুঁজি শুধুমাত্র ব্রিটিশ উপনিবেশেই বিনিয়োগ করা যেত। কিন্তু আজকের লগ্নীপুঁজির বিশ্বের যেকোনো বাজারেই বিনিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যা মার্কস তো দ্যাখেনই নি, এমনকি লেনিনও শুধুমাত্র প্রবণতার সূচনাটুকু দেখে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন, তা হল পুঁজির বিনিয়োগের মাধ্যমে পণ্য উৎপাদন এবং সেই পণ্য বিক্রয় করে মুনাফা ও উদ্বৃত্ত মূল্যের সৃষ্টি, পুঁজিবাদী উৎপাদনের এই স্বাভাবিক পক্রিয়ার মধ্যে না থেকে, সরাসরি পুঁজির বিনিয়োগের মাধ্যমে নতুন কোন

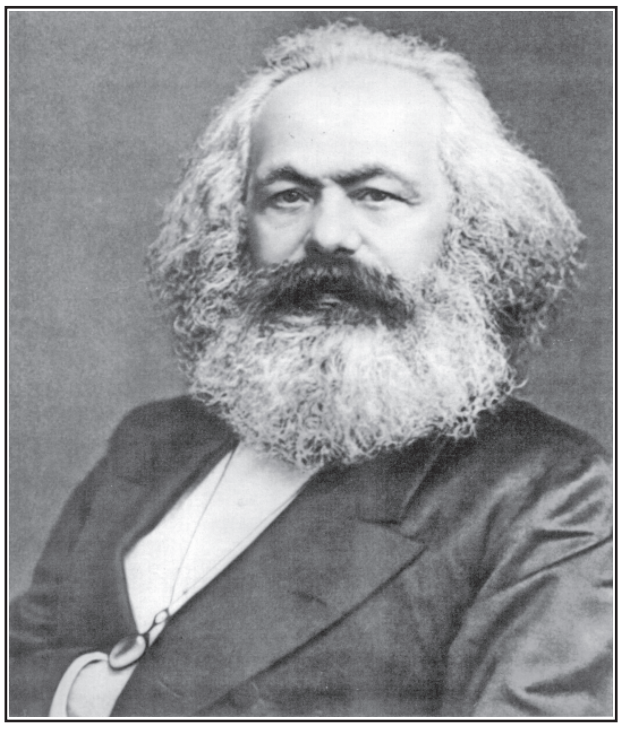

অথচ মাত্র আড়াই দশক কাটতে না কাটতেই, সেই সোৎসাহ চিল চিৎকার মৃদু থেকে মৃদুতর হতে শুরু করলো। এমনকি যে সমস্ত দেশে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির দপ্তরে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে মার্কসকে 'আলবিদা করা হয়েছিল, সেখানেও মানুষ আবার নতুন করে মার্কসকে সামনে রেখে লালঝাণ্ডার নিচে সমবেত হতে শুরু করলেন। এমনকি 'ইতিহাসের অবসান' তত্ত্বের রচয়িতা ফ্রান্সিস ফুকুয়ামাও ঢোঁক গিলে তাঁর নিজের তত্ত্বের বিরুদ্ধেই প্রশ্ন খাড়া করতে শুরু করলেন। কেন? কি এমন ঘটলো যে ভ্যাটিক্যান সিটির পোপও 'ওল্ড টেস্টামেন্ট' ছেড়ে 'দাস ক্যাপিটাল'-এ মনোনিবেশ করতে শুরু করলেন।

পণ্য উৎপাদন না করেই উদ্বৃত্ত পুঁজির সৃষ্টি। অর্থাৎ মার্কস বর্ণিত M (পুঁজি) → C (পণ্য) → M' (উদ্বৃত্ত পুঁজি) এর পরিবর্তে সরাসরি M (পুঁজি) → M' । উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোনো একটি বিদেশী ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান, এদেশে এসে ব্যাঙ্কের শাখা খুলে ব্যবসা শুরু করল এবং মুনাফা করল। এখানে একটি নতুন ব্যাঙ্কের শাখা প্রতিষ্ঠিত হল মানে, পণ্য অর্থাৎ নতুন সম্পদ সৃষ্টি হল এবং তা থেকে বিদেশী ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানটি মুনাফা এবং উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করল (M→C→M')। কিন্তু ঐ ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানটি যদি এদেশে এসে তাদের নতুন কোন শাখা না খুলে, কোন বৃহৎ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের অংশীদারিত্ব ক্রয় করে মুনাফা অর্জন করে এবং উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করে, সেক্ষেত্রে কোন নতুন সম্পদ সৃষ্টি হল না। বিদেশী ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানটি শুধুমাত্র পুঁজি বিনিয়োগ করে বাড়তি পুঁজি নিয়ে ফিরে গেল (M→M')।

এই প্রসঙ্গে দুটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। প্রথমত চলতি কথায় আমরা মুনাফা ও উদ্বৃত্ত মূল্যকে অনেক সময় একই অর্থে ব্যবহার করি। কিন্তু দুটি আদৌ একই বিষয় নয়। মুনাফার অর্থ হল, একজন পুঁজিপতি কোন একটি পণ্য উৎপাদনের জন্য সর্বমোট যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেন। (মেশিনের রক্ষণাবেক্ষণ, বিদ্যুতের বিল, কাঁচামাল, শ্রমিকের মজুরি, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করার জন্য পরিবহণ খরচ ইত্যাদি) এবং পণ্য বিক্রয় করে যে পরিমাণ অর্থ আয় করেন, এই দুইয়ের পার্থক্যই হল মুনাফা। কিন্তু উদ্বৃত্তমূল্য সম্পূর্ণভাবেই শ্রমের মূল্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেমন একজন শ্রমিক দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজ করে ৪০০ টাকা মূল্যের পণ্য উৎপাদন করে। কিন্তু তার দৈনিক মজুরির পরিমাণ ২০০ টাকা। মজুরি হল তার শ্রমের মূল্য। অর্থাৎ সে যা মজুরী পায়, তা তার ৪ ঘণ্টা শ্রমের মূল্য। বাকি ৪ ঘণ্টা সে কাজ করে বিনা মজুরিতে। এই ৪ ঘণ্টা শ্রমের মূল্য আত্মসাৎ করে মালিক। যা উদ্বৃত্ত মূল্য বা সারপ্লাস ভ্যালু। এমনকি সাধারণ সঙ্কটের সময় মুনাফায় ভাঁটা পড়লেও, উদ্বৃত্তমূল্য কিন্তু সৃষ্টি হয়।

এই প্রসঙ্গেই দ্বিতীয় যে বিষয়টি উল্লেখযোগ্য তা হল, অনেক সময় একথাও বলা হয়, উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি হয় শুধুমাত্র শিল্পপণ্যের ক্ষেত্রেই। পরিষেবা ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত কর্মচারীরা কোন উদ্বৃত্তমূল্য সৃষ্টি করে না। মার্কসীয় অর্থনীতির ব্যাখ্যা অনুযায়ী এই বক্তব্য কিন্তু সঠিক নয়। মার্কস তাঁর পুঁজি গ্রন্থেই বলেছেন পরিষেবা ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত কর্মচারী, শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রযুক্তিবিদ সকলেই উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টির মাধ্যমে শোষিত হন।

এবারে আমরা মূল আলোচনায় ফিরে যেতে পারি। আজকের পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার অনেকগুলি বৈশিষ্ট মার্কস দেখে যেতে পারেননি। তা সত্ত্বেও বর্তমান সঙ্কটে হিমসিম খাওয়া পুঁজিবাদের শিরোমনিরা কার্ল মার্কসের 'পুঁজি' গ্রন্থটির পাতাগুলিকে হাতড়াচ্ছেন কেন? এর কারণই হল মার্কস পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার ব্যবচ্ছেদ করে দেখিয়েছিলেন, এর সঙ্কটের কারণ নিহিত রয়েছে শোষণমূলক চরিত্রের মধ্যেই। যা উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তীব্রতর হয়। যতবেশী আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার হয়, ততবেশী মোট শ্রমমূল্যে শ্রমিকের মজুরির অংশ হ্রাস পেতে থাকে। যেমন এক সময়ে শ্রমিক ৮ ঘণ্টা কাজ করে ৪০০ টাকা মূল্যের পণ্য উৎপাদন করত। আজ ৮ ঘণ্টা কাজ করে সে ১২০০ টাকা মূল্যের পণ্য উৎপাদন করে। অথচ দৈনিক মজুরি বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৪৫০ টাকা। অর্থাৎ তার মজুরি দৈনিক ৩ ঘণ্টা শ্রমমূল্যের সমান। বাকি ৫ ঘণ্টা সে কাজ করে বিনা মজুরিতে। এই ৫ ঘণ্টা শ্রমের মূল্য মালিক আত্মসাৎ করে। ফলে মালিকের উদ্বৃত্ত মূল্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। অনেক সময় খোলা চোখে দেখে অনেকে বলেন, কেন শ্রমিকের মজুরিতে ২০০ টাকা থেকে বেড়ে ৪৫০ টাকা হল। কিন্তু যা চোখের আড়ালে থাকে তা হল, কিছু পরিমাণ মজুরী বৃদ্ধির অছিলায় শোষণের মাত্রা কিন্তু বৃদ্ধি পেয়েছে। আগে শ্রমিক দৈনিক ৪ ঘণ্টা কাজ করতেন বিনা মজুরিতে, আজকে দৈনিক ৫ ঘণ্টা কাজ করছেন বিনা মজুরিতে। পুঁজিবাদ তার বাইরের প্রসাধনের যতই পরিবর্তন করুক, এই অন্তর্নিহিত চরিত্রের কখনই পরিবর্তন ঘটে না। মার্কস তাই বলেছিলেন, মালিক-শ্রমিক চুক্তি কখনই ন্যায্যতার ওপর ভিত্তি করে তৈরী হয় না। শ্রমিক তার বেঁচে থাকার প্রয়োজনগুলি মেটানোর জন্য মজুরি বৃদ্ধির দাবি করে। মজুরি হয়ত কিছুটা বৃদ্ধিও পায়, কিন্তু শোষণের তীব্রতাও পাল্লা দিয়ে বৃদ্ধি পায়। যা এই ব্যবস্থার মধ্যে থেকে কোন আদর্শ চুক্তির মাধ্যমে অবসান ঘটানো যায় না।

আজকে নয়া উদারবাদী অর্থনীতির পর্বে অবশ্য খোলা চোখেই শোষণের তীব্রতা ধরা পড়ছে। কারণ আজকের পুঁজিবাদের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট হল স্থায়ী চরিত্রের শ্রমিকের পরিবর্তে, অস্থায়ী চরিত্রের শ্রমিক নিয়োগ। যাদের মজুরি যৎসামান্য। ফলে আজকে একটি উৎপাদন কেন্দ্রে শ্রমিক (অস্থায়ী) পিছু সৃষ্ট উদ্বৃত্ত মূল্যের পরিমাণ অনেক বেশী। জন হেনরীর মতন আদুল গায়ে গনগনে চুল্লির আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে হয়ত কাজ করতে হয় না। কিন্তু শীততাপ নিয়ন্ত্রত ঘরে, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সামনে বসে কাজ করছেন যে হোয়াইট কলারড্ শ্রমিক, তিনি কিন্তু অনেকবেশী শোষিত হচ্ছেন। এঙ্গেলস্ লিখেছিলেন, 'কন্ডিশন অফ ওয়ার্কিং ক্লাস ইন ইংলন্ড'। শ্রমিক মহল্লার অবর্ণনীয় দুর্দশার কথা লিখেছিলেন এঙ্গেলস্। আজকের ম্যাঞ্চেস্টারে তেমন শ্রমিক মহল্লার দেখা মিলবে না। 'কন্ডিশন অফ ওয়ার্কিং ক্লাস ইন ইংল্যন্ড'— হয়ত আপাতদৃষ্টিতে উন্নত হয়েছে। কিন্তু শোষণ কি হ্রাস পেয়েছে? না।

তাই মার্কসের প্রত্যয়দৃপ্ত ঘোষণা— পুঁজিবাদের উচ্ছেদ ব্যতিরেকে এর শোষণ প্রক্রিয়ার অবসান সম্ভব নয়। আর পুঁজিবাদী শোষণ থেকেই সৃষ্টি হয় তার চিরকালিন সঙ্কট। তাই সঙ্কটে পড়লেই মার্কসের খোঁজ পড়ে। ব্যাক টু মার্কস। □

কমরেড মনিকা পালের স্মরণসভা

শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন বিজয় শংকর সিংহ (সাধারণ সম্পাদক)

শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন গৌতম পাল (পুত্র)

গত ২৭ জুলাই ২০১৮ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সেস অ্যাসোসিয়েশন ও রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতির যৌথ উদ্যোগে কর্মচারী ভবনে কমরেড মনিকা পালের স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্মৃতি চারণা করে বক্তব্য রাখেন বিজয় শংকর সিংহ, সুশীল ব্রহ্ম, গীতা দে এবং তাঁর পুত্র গৌতম পাল। সভাপতিমণ্ডলীতে ছিলেন অসিত ভট্টাচার্য, শ্যামচাঁদ মণিগ্রাম এবং সীমা সাহা।

▶▶ দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর

বাজপেয়ীর জীবনাবসান

তেহেলকা দুর্নীতি, গুজরাট হিংসার মতো ঘটনা ঘটে এই সময়ে। ২০০৪ সালে বাজপেয়ীর 'শাইনিং ইন্ডিয়া' শ্লোগানকে হারিয়ে ক্ষমতায় আসে ইউ পি এ সরকার। শেষ হয় অটল যুগের। আর ফেরেননি বাজপেয়ী। ২০০৫ সালে রাজনীতি থেকে অবসর নেন। ২০০৯ সালে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। তারপর কার্যত গৃহবন্দী। মোদি জমানায় তিনি পেয়েছেন ভারতরত্ন সম্মান। তাঁর জন্মদিনকে সুশাসন দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছেন নরেন্দ্র মোদি।

কট্টর হিন্দুত্ববাদী ও ভারতবর্ষকে হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করায় সংকল্পবদ্ধ দল হিসেবে বিজেপি'র প্রতিষ্ঠা হলেও অনেকেই বাজপেয়ীকে দলের আর সব নেতাদের মতো চরম সাম্প্রদায়িক বলে চিহ্নিত করেন না। পরন্তু অনেকেই তাঁকে কিছুটা ধর্মনিরপেক্ষ হিসেবেও দেখতে চেষ্টা করেন। কিন্তু বাজপেয়ীকে ঘিরে এইসব কথাবার্তার মধ্যে সত্য-মিথ্যা যাই থাক না কেন একথা অনস্বীকার্য যে, বিজেপি'র মদতপুষ্ট সঙ্ঘবাহিনীর হাতে বাবরি মসজিদ ধ্বংস হওয়ার ঘটনায় তিনি ছিলেন চূড়ান্তভাবে নীরব দর্শক। আবার গুজরাটে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বিজেপি-সরকারের মদতে যখন দিনের পর দিন ভয়ঙ্কর গণহত্যা চলতে থাকলো তখনও বিস্ময়কর দার্শনিক মৌনতায় তিনি ছিলেন নীরব দর্শকই। শুধুমাত্র রাজধর্ম পালনের উপদেশটুকু দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করেননি। □

মোদি সরকারের চার বছর—আক্রান্ত দেশের আর্থ রাজনৈতিক ব্যবস্থা

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

কেন্দ্রে বি জে পি নেতা নরেন্দ্র মোদি পরিচালিত এনডিএ সরকারের চার বছর গত মে মাসে পূর্ণ হলো। ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনে মাত্র ৩১ শতাংশ ভোট পেয়ে বি জে পি এককভাবে ২৮৩টি আসনে জয়ী হয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, এবং গঠিত হয় বিজেপি নেতৃত্বাধীন দ্বিতীয় এনডিএ সরকার। প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হন আর এস এসের প্রথম সারির প্রচারক নরেন্দ্র মোদি। দীর্ঘ আড়াই দশক পর কেন্দ্রে পুনরায় একদলীয় সরকার প্রতিষ্ঠায় সেদিন ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পরিচালিত বৃহৎ সংবাদপত্র ও প্রচার মাধ্যমগুলি উল্লসিত হয়েছিল। প্রাক্ নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে নরেন্দ্র মোদি ঘোষণা করেছিলেন, ক্ষমতাসীন হওয়ার পর বছরে দু'কোটি বেকারের চাকরি, বিদেশী ব্যাঙ্কে মজুত ভারতীয়দের কালো টাকা উদ্ধার করে প্রত্যেকটি ভারতীয়র একাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা জমা করে দেওয়া প্রভৃতি প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এসবের হাল কী হয়েছে? বছরে দু'কোটি বেকারের চাকরির পরিবর্তে বি-মুদ্রাকরণ এবং জি এস টি চালু হওয়ার পরিণতিতে লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মচ্যুতি ঘটেছে। অন্যদিকে বিদেশী ব্যাঙ্কে মজুত থাকা ভারতীয়দের কালো টাকা উদ্ধারের পরিবর্তে এই চার বছরে বিদেশী ব্যাঙ্কে ভারতীয়দের সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই চার বছরে মোদি সরকারের শাসনে চতুর্মুখী আক্রমণ তীব্র হয়েছে। এই আক্রমণ হলো—(১) নব্য উদারনীতির আক্রমণ, যার মধ্য দিয়ে বিপন্ন হয়ে পড়ছে দেশের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব। (২) দেশের ঐতিহ্যমণ্ডিত ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ আজ আক্রান্ত। বি জে পি সরকারকে সামনে রেখে আর এস এস হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের ছক কষছে। (৩) সংসদীয় গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক অধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর আক্রমণ সংগঠিত করার মধ্য দিয়ে সরকারের মধ্যে স্বৈরাচারী প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। (৪) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কনিষ্ঠ অংশীদার হওয়ার উদগ্র বাসনাতে এই সরকার দেশের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সামরিক বোঝাপড়া তীব্রভাবে বৃদ্ধি করে চলেছে। এসবের মধ্য দিয়ে দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রধান চারটি স্তম্ভ যথা—(ক) অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব, (খ) ধর্মনিরপেক্ষতা, (গ) সংসদীয় ব্যবস্থা এবং (ঘ) স্বাধীন বিদেশনীতি আক্রান্ত হয়ে পড়েছে।

দুই

নব্য উদারনীতির আক্রমণ ঃ ১৯৯১ সাল থেকে অর্থাৎ নরসিমা রাও পরিচালিত কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের শাসনকালে গৃহীত নব্য উদারনীতি, জাতীয় অর্থনীতিতে সৃষ্টি করে চরম সঙ্কট। কিন্তু নরেন্দ্র মোদি সরকার এখান থেকে শিক্ষা নেওয়ার পরিবর্তে একে আরও উগ্রভাবে প্রয়োগ করতে থাকে। এর পরিণতি হয়েছে ভয়াবহ। প্রধানত পাঁচটি ক্ষেত্রে এই আক্রমণ কেন্দ্রীভূত হয়।

মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, দারিদ্র ঃ নরেন্দ্র মোদি সরকারের চার বছরের শাসনে এই তিনটি ক্ষেত্রেই আক্রমণ কেন্দ্রীভূত হয়েছে যা জনজীবনে সৃষ্টি করে চলেছে চরম বিপর্যয়কর পরিস্থিতি। সরকারী তথ্য অনুযায়ী পাইকারী মূল্য সূচকের মাপকাঠিতে গত জুন মাসে মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল ৫.৭৭ শতাংশ। ২০১৩ সালের ডিসেম্বর মাসের পরবর্তীকালে এই হার হলো সর্বোচ্চ। এই সময়কালে প্রতিটি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী, বিশেষত খাদ্য দ্রব্যের মূল্য ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। নরেন্দ্র মোদি সরকারের আমলে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম কম থাকা সত্ত্বেও বিপুল পরিমাণ শুল্ক আরোপ করে তার কোনো সুবিধা আমজনতাকে দেওয়া হয়নি। এছাড়া, গণবণ্টন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা, কৃষিপণ্যের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করা প্রভৃতি পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় মূল্যবৃদ্ধিতে লাগাম পড়ানো যায়নি।

এই সময়কালের মধ্যে দারিদ্র ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৫ সালে প্রকাশিত সোশিও ইকনমিক কাস্ট সেনসাস (সি ই সি এস) অনুযায়ী গ্রামীণ ভারতের ৭৫ শতাংশ পরিবারের মাসিক আয় পাঁচ হাজার টাকার কম। গ্রামীণ এলাকায় শীর্ষ দশ শতাংশের গড় সম্পদ নীচুতলার দশ শতাংশের গড় সম্পদের তুলনায় ২২৮ গুণ বেশি। গ্রামীণ ভারতে উপরের দশ শতাংশের হাতে ৪৮ শতাংশ সম্পদ রয়েছে। সর্বশেষ অক্সফ্যাম রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১৭ সালে সৃষ্ট অতিরিক্ত সম্পদের ৭৩ শতাংশ এক শতাংশ ধনীদের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে।

বিগত চার বছরে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে চিত্রটি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এক সমীক্ষা অনুযায়ী মোদি সরকারের প্রথম দুই বছরের শাসনে দশ লক্ষ মানুষ কাজ হারিয়েছে। ২০১৪-১৫ সালে পূর্বের বছরের তুলনায় ৭.৭ লক্ষ কম লোক কাজ করেছে। ২০১৫-১৬ সালে এই পরিমাণ ছিল ৩.৮ লক্ষ। গ্রামীণ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে চিত্রটি আরো ভয়াবহ। ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে প্রকৃত বরাদ্দ ক্রমহ্রাসমান। এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সব থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন মহিলা, দলিত ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ। কর্মসংস্থানের ভয়াবহ চিত্রটির ভয়াবহতা একটি মাত্র পরিসংখ্যানেই স্পষ্ট হয়। এটি হলো রেলওয়ের এক লক্ষ শূন্যপদের জন্য ২ কোটি মানুষ দরখাস্ত করেছে।

সামাজিক প্রকল্পে ব্যয় হ্রাস ঃ নব্য উদারনীতির দ্বিতীয় আক্রমণের ক্ষেত্রটি হলো সামাজিক কল্যাণমূলক খাতে ব্যয় হ্রাস। ১০০ দিনের কাজ, আই সি ডি এস, পানীয় জল সরবরাহ, ময়লা জল নিষ্কাশন সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যয় হ্রাস করা হচ্ছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলি অবহেলিত হচ্ছে। ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত কোঠারী কমিশনের (১৯৬৪-৬৬) রায়ে শিক্ষাক্ষেত্রে জিডিপি'র ৬ শতাংশ ব্যায়ের সুপারিশ করা হয়েছিল। ২০১৮-১৯ সালে শিক্ষাখাতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির মিলিত ব্যয়ের পরিমাণ হলো মাত্র ০.৪৫ শতাংশ, ২০১৩-১৪ সালে অর্থাৎ মোদি সরকার প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বে এই পরিমাণ ছিল ০.৭১ শতাংশ। স্বাস্থ্য খাতেও একই চিত্র।

রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বেসরকারীকরণ ঃ দেশের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বের অন্যতম প্রধান ভিত্তি হলো রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক, রাষ্ট্রায়ত্ত বীমা এবং সরকারী পরিষেবা। প্রতিটি ক্ষেত্রই বিগত চার বছরে ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হয়েছে। বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়ার তিনটি দিক রয়েছে। এগুলি হলো—(১) রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র যেমন প্রতিরক্ষা উৎপাদন, রেলওয়ে, ব্যাঙ্ক বীমার ন্যায় ক্ষেত্রগুলির বেসরকারীকরণ, (২) রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ বিদেশী বিনিয়োগের জন্য খুলে দেওয়া এবং (৩) বিদ্যুৎ বণ্টন, জল সরবরাহ এবং পরিবহনের ন্যায় মৌলিক পরিষেবার বেসরকারীকরণ। কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা নীতি আয়োগ সম্প্রতি ৭৪টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বিলগ্নীকরণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে কয়েকটি সংস্থাকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে যেগুলির স্ট্র্যাটেজিক সেলের মাধ্যমে বিলগ্নীকরণ করা হবে। এই ৭৪টি সংস্থার মধ্যে রয়েছে রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী সংস্থা এ এম পি। এছাড়া লাভজনক সংস্থা, নবরত্ন, স্ট্র্যাটেজিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রভৃতি সংস্থাও রয়েছে। অথচ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি সর্বশেষ বছরে কর, ডিভিডেন্ট প্রভৃতি বাবদ লক্ষাধিক কোটি টাকা কেন্দ্রীয় কোষাগারে জমা দিয়েছে।

দেশের ২১টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে বর্তমানে সম্পদের পরিমাণ ১০০ লক্ষ কোটি টাকা অতিক্রম করে গেছে। সঞ্চয়ের পরিমাণ ৮৮ লক্ষ কোটি টাকা। ব্যাঙ্কগুলির অপারেশনাল প্রফিটের পরিমাণ ১ লক্ষ কোটি টাকা অতিক্রম

করে গেছে। কিন্তু রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির বিপুল পরিমাণ অনাদায়ী ঋণ বা এন পি এ বিশেষ উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নরেন্দ্র মোদি সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার কিছু সময় পর, অর্থাৎ ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে এই ধরনের ঋণের পরিমাণ ছিল ২.৬ লক্ষ কোটি টাকা। ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৮.৩৭ লক্ষ কোটি টাকা। এতদ্‌সত্ত্বেও নরেন্দ্র মোদি সরকারের শাসনকালে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলি ২ লক্ষ ২৯ হাজার ৮২ কোটি টাকা ঋণ মকুব করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তথ্য অনুযায়ী অনাদায়ী ঋণের ৮৫ শতাংশ হলো বৃহৎ ব্যবসায়ী ও কর্পোরেট সংস্থাগুলির ঋণ।

কেন্দ্রীয় সরকার এই অনাদায়ী ঋণ উদ্ধার করতে ব্যর্থ। এর দায় তারা ব্যাঙ্কের সাধারণ গ্রাহকদের উপর চাপিয়ে দিতে চাইছে। এর জন্য আনা হয়েছিল এফ আর ডি আই বিল। অবশ্য প্রতিবাদ ও আন্দোলনের চাপে তারা পিছু হটে।

বিদেশী পুঁজির নিকট আত্মসর্মপণ ঃ নব্য উদারনীতির পথ ধরে জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্র বিদেশী পুঁজির নিকট উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। রেল, প্রতিরক্ষা, ব্যাঙ্ক, বীমা, টেলিযোগাযোগ প্রভৃতির ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিকে বিদেশী পুঁজির নিকট উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে বা হচ্ছে। এর ফলে জাতীয় অর্থনীতির সার্বভৌমত্ব আজ চূড়ান্ত বিপদের সম্মুখীন।

বিত্তবানদের সুযোগ সুবিধা ঃ নরেন্দ্র মোদি সরকার বিভিন্ন শিল্পপতি গোষ্ঠীকে নানানভাবে বিপুল পরিমাণ কর ছাড় দিয়ে চলেছে। প্রতি বছর এক্সাইজ ডিউটি, কাস্টমস ডিউটি, কর্পোরেট ট্যাক্স, ইনকাম ট্যাক্স বাবদ গড়ে এই ছাড়ের পরিমাণ ৬ লক্ষ কোটি টাকার বেশি।

নব্য উদারনীতির পথ ধরে ব্যাপক আর্থিক দুর্নীতি প্রকাশ পাচ্ছে। সম্প্রতি রাফেল বিমান ক্রয় কেলেঙ্কারিতে দেশে তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নির্বিকার। প্রাকৃতিক সম্পদের লুঠ চলছে।

এসবের পরিণতিতে জাতীয় অর্থনীতিতে সৃষ্টি হয়েছে ব্যাপক সঙ্কট। জনগণের অবস্থা হয়ে উঠেছে দুর্বিষহ।

দুই

আর্থিক ক্ষেত্রে নব্য উদারনীতির প্রয়োগের পাশাপাশি দেশের ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ আজ ভুলুণ্ঠিত। সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক বিভাজন ঘটিয়ে নির্বাচনে ফায়দা লোটার অপচেষ্টায় আর.এস.এস-বিজেপি সক্রিয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, গোরক্ষা, ঘরওয়াপসি, লাভ জিহাদ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে চলছে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের ষড়যন্ত্র। কাশ্মীর ইস্যু, বিদেশী বিতরণ প্রভৃতি বিষয়কেও কাজে লাগানো হচ্ছে। সম্প্রতি জম্মু-কাশ্মীর মন্ত্রিসভা থেকে বি জে পির বেরিয়ে আসার ঘটনা যে এই লক্ষ্যেই পরিচালিত---এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আর.এস.এস-বিজেপির দুটি ইস্যু পাকিস্তান এবং মুসলিম উভয়ই এই প্রশ্নে জড়িত।

আর এস এস-বিজেপি চক্র বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবগুলির সাম্প্রদায়িকীকরণ করছে। বিগত চার বছরে দেশের বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সর্বোচ্চ পদে আর এস এসের কট্টর সমর্থকদের বসানো হয়েছে। আই সি এইচ আর, বিভিন্ন কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, এফ টি আই আই, ইউ জি সি প্রভৃতির ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের পদে আসীন রয়েছে কট্টর আর এস এস কর্মীরা। অধিকাংশ রাজ্যের রাজ্যপালের পদগুলি অলঙ্কৃত করে রয়েছে আর.এস.এসের লোকজন। এদের অনেকেই নিজেদের পদমর্যাদা ভুলে সাম্প্রদায়িক কর্মসূচীর পক্ষে সওয়াল করে চলেছে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক সংস্থাগুলিকে অন্তর্ঘাত চালিয়ে ভিতর থেকে ধ্বংসের প্রয়াস চালানো হচ্ছে। আর. এস. এস এবং বি জে পি-র শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্ব এখন প্রকাশ্যেই দেশের সংবিধানকে পরিবর্তনের দাবি জানাচ্ছে।

আর এস এস কোনোদিনই স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেনি। তাই এদের কাছে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের কোনো গুরুত্বই নেই। এই কারণে এরা এখন দাবি করছে যে ভারতের ইতিহাস থেকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসকে আলাদা করতে হবে।

বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান ও গবেষণার জন্য ব্যয় বরাদ্দ ছাঁটাই করা হচ্ছে। ২০১৭-১৮ সালে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে এক হাজারের বেশি পি এইচ ডি এবং এম ফিল পদ ছাঁটাই করা হয়েছে। কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামির ভিত্তিতে বিজ্ঞান বিরোধী মতামতকে সরকারী ভাবে প্রচার করা হচ্ছে। এইসব ধারণার প্রভাব দু'ভাবে মহিলাদের উপর পড়ছে। প্রথমত মহিলারা পুরুষের অধীন থাকবেন এবং দ্বিতীয়ত মনুবাদী ধারণা অনুযায়ী তারা থাকবেন।

কেন্দ্রীয় সরকার যখন উপর থেকে হিন্দুত্ববাদী কর্মসূচী চাপিয়ে দিচ্ছে তখন নীচের তলার আর এস এস নেতৃত্বাধীন হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি অবাধে যা খুশি করে যাচ্ছে। মুসলিমদের আক্রমণের লক্ষ্য করে পশু ব্যবসায়ী এবং কৃষকদের উপর গেরুয়া বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ছে, দলবদ্ধভাবে তারা পিটিয়ে হত্যার অভিযান চালাচ্ছে। এই ফ্যাসিস্ট ধর্মী আক্রমণের মধ্য দিয়ে বিগত কয়েক বছরে গোরক্ষার অজুহাতে ৩২/৩৩ জন মানুষকে ওরা খুন করেছে। পশু ব্যবসা এবং মৃত পশুদের চামড়া ছাড়ানোর কাজ করেন যে দলিতরা, তাঁদেরও আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করছে হিন্দুত্ব বাহিনী। গুজরাটের একটি এলাকা উনায় চারজন দলিত সম্প্রদায়ের যুবককে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে।

যে সমস্ত বুদ্ধিজীবী কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা বা হিন্দুত্ববাদী প্রচারের বিরোধিতা করছেন, তাদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হচ্ছে। মহারাষ্ট্রে নরেন্দ্র দাভোলকরকে হত্যার পর খুন হয়েছেন গোবিন্দ পানেসর। কর্ণাটকে অধ্যাপক এম এম কালবুর্গীকে হত্যা করা হয়েছে। এরপর হত্যা করা হয়েছে গৌরী লঙ্কেশকে। যুক্তিবাদী ও মুক্তমনা বুদ্ধিজীবিদের খুন করে এই অংশকে চুপ করিয়ে রাখা তো এক ফ্যাসিস্ট ধাঁচের পরিকল্পনা তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

সংসদীয় গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর আক্রমণ ঃ নরেন্দ্র মোদি সরকারের বিগত চার বছরের সময়ে সংসদীয় গণতন্ত্র নানাদিক থেকে আক্রান্ত হয়েছে। সংসদের বার্ষিক অধিবেশনের সময়কাল লক্ষ্যণীয়ভাবে কমানো হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী লোকসভায় প্রায়ই অনুপস্থিত থাকেন। বিরোধীদের বক্তব্য বলতে শাসকদলের পক্ষে বাধা দেওয়া হয়। সংসদে বিরোধীদের মর্যাদাদানের প্রশ্নে গঠিত স্ট্যান্ডিং কমিটি, সিলেক্ট কমিটি গুলিকেও অকার্যকর রাখা হয়েছে। বি জে পি পরিচালিত এন ডি এ-র যেহেতু রাজ্য সভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই, তাই রাজ্যসভাকে এড়িয়ে যেতে যে কোনো বিলকে অর্থ বিল আখ্যা দেওয়া হচ্ছে।

দেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের অন্যতম ভিত্তি হল যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। এই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাও এখন নানাভাবে আক্রান্ত । সুপরিকল্পিত ভাবে রাজ্যগুলির অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। কর আদায়ের যে সামান্য ক্ষমতাটুকু রাজ্যগুলির ছিল, তাও জি এস টি আরোপের মধ্য দিয়ে হরণ করা হয়েছে। রাজ্যগুলির প্রাপ্য তহবিলও একতরফা ভাবে কেন্দ্রীয় সরকার ছাঁটাই করে চলেছে। কেন্দ্রীয় সরকার পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের বিচার্য বিষয় যেভাবে নির্দিষ্ট করেছে তার মধ্য দিয়ে রাজ্যগুলির অধিকারকে হরণ করা হয়েছে। রাজ্যে রাজ্যে রাজ্যপালের পদকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। সম্প্রতি কর্ণাটকের রাজ্যপাল অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রীকে আস্থা ভোটের জন্য এক মাস সময় নির্দিষ্ট করে দিলেন, যাতে অন্য দলের বিধায়ক ক্রয় করে বিজেপি সরকার গঠন করা যায়। শেষপর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপে এই চক্রান্ত ব্যর্থ হয়। এর পূর্বে রাজ্যপালকে ব্যবহার করে উত্তরাখণ্ড এবং অরুণাচল প্রদেশে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করা হয়েছে। এখন নরেন্দ্র মোদি শ্লোগান তুলেছেন, এক দেশ, এক নির্বাচন। এর অর্থ হলো এই যে লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন একসাথে করা। এর মধ্য দিয়ে জনগণের পাঁচ বছরের জন্য সরকার গঠনের অধিকার হরণ করা হবে।

হিন্দুত্ববাদী শক্তি এবং কর্পোরেট বা বৃহৎ শিল্পপতিরা ঐক্যবদ্ধভাবে রাষ্ট্রকে স্বৈরাচারের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। বিরোধীদের গায়ে জাতীয়তাবিরোধী তকমা এঁটে দিয়ে তাদের কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে এবং ইউ এ পি এ বা বেআইনী কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইন এবং রাজদ্রোহীতার বিভিন্ন ধারা পর্যন্ত প্রয়োগ করা হচ্ছে।

শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠন করার অধিকার, দরকষাকষির অধিকার এবং সর্বোপরি ধর্মঘটের অধিকার হরণ করতে ক্রমাগত শ্রমআইনগুলিকে মালিকের স্বার্থে সংশোধন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদির সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, ৪৫টি শ্রম আইনকে ৫টি লেবার কোডে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। ইতোমধ্যে এ সম্পর্কিত দুটি লেবার কোড প্রকাশিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন শিল্প সংস্থায় 'ফিক্সড টার্ম এমপ্লয়মেন্ট বোর্ড' ব্যবস্থা চালু করছে। এর মধ্য দিয়ে 'হায়ার এন্ড ফায়ারে'র অস্ত্র মালিকশ্রেণীর হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। এইসব কার্যকলাপের মধ্যে চরম স্বৈরাচারীর প্রবণতার বহিঃপ্রকাশ ঘটছে।

চার

১৯৯১ সালে চালু হওয়া নব্য উদারনীতির পথ ধরে ভারতের বিদেশনীতি

▶▶ ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

বকেয়া দাবি আদায়ে পথে নামুন

বিজয়শংকর সিংহ
সাধারণ সম্পাদক, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

বর্তমানে ২০১৬ সালের পর প্রশাসনের অভ্যন্তরে ও সার্বিকভাবে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহভাবে কঠিন ও জটিল হয়েছে। রাজ্যে গণতন্ত্রের ওপর নজিরবিহীন আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজ্যের সাধারণ মানুষ সহ বিশেষ করে আমাদের কর্মচারীরা প্রত্যক্ষ করেছেন যে ব্যাপক সন্ত্রাস ও ভোট লুঠ তা ভূ-ভারতে কোথাও কোনোদিন হয়নি। দেশের প্রধান বিচারালয় বলছে ৩৪ শতাংশ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হওয়া এবং ভোট লুঠসহ গণনায় রিগিং যা নজিরবিহীন ঘটনা। এই পঞ্চায়েত মানুষের রায়ে নির্বাচিত পঞ্চায়েত নয়। এই পঞ্চায়েত হলো অবৈধ পঞ্চায়েত। একদলীয় শাসন চালানোর জন্য ফ্যাসিবাদী কায়দায় আক্রমণ করে তৈরি করা এই পঞ্চায়েত। এক কথায় আমাদের রাজ্যে গণতন্ত্রকে খুন করা হয়েছে।

পাশাপাশি ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকারসহ শ্রমিক কর্মচারীদের অর্জিত অধিকার আক্রান্ত হচ্ছে। প্রশাসনের অভ্যন্তরে নীরবে প্রশাসনিক সন্ত্রাসসহ হয়রানিমূলক বদলী হচ্ছে যা কর্মচারী মনোজগতে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। আমলাদের মধ্যে একটা অংশ চরমভাবে কর্মচারী বিরোধী মানসিকতা নিয়ে আক্রমণ করছে। এছাড়া কর্মচারীদের পাহাড়প্রমাণ আর্থিক বঞ্চনা ও বৈষম্য চলছে।

পশ্চিমবাংলায় নবজাগরণ ও সামাজিক সংস্কার হয়েছে যা সারা দেশে ও বিশ্বে আমাদের সম্মান এনে দিয়েছিল। প্রগতিশীল সংগ্রাম আন্দোলন বিশেষ করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও দেশের বহুত্ব বাদকে অনুসরণ করার পীঠস্থান ছিল রবীন্দ্র নজরুলের পশ্চিমবাংলা যা আমাদের সারা দেশের কাছে গর্ব ছিল, তা আজ আক্রান্ত। রাজ্যের শাসক দল ভোটের রাজনীতির স্বার্থে বহুমাত্রিক সাম্প্রদায়িকতার বিপদকে আমাদের রাজ্যে ডেকে আনছে, যা ভয়ঙ্কর বিপদের দিক।

এরকম একটা অস্থির ভয়াবহ পরিস্থিতিতে প্রশাসনের অভ্যন্তরে একমাত্র আমাদের সংগঠন কর্মচারী সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে ধারাবাহিকভাবে এই পরিস্থিতিকে ভেদ করেই সর্বত্র লড়াই সংগ্রাম জারি রেখেছে। দলমত নির্বিশেষে সব কর্মচারীরা সরাসরি দেখছেন আমাদের সংগঠন এতো আক্রমণ সত্ত্বেও, বিশেষ করে এফ আই আর (দশটি ধারাসহ), শো-কজ সাসপেনশনের ভয়কে উপেক্ষা করেই সরাসরি প্রত্যক্ষ সংগ্রামে যুক্ত হচ্ছে।

বিগত বছরগুলিতে একের পর এক সংগ্রামে দলমত নির্বিশেষে কর্মচারী সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে আমরা যুক্ত হয়েছি। কলকাতার বুকে ও রাজ্য জুড়ে জেলায় জেলায় গণঅবস্থান, কেন্দ্রীয় ভাবে ও জেলার একাধিক বৃহৎ মিছিল, টিফিনের সময় সরকারের পাহাড় প্রমাণ বঞ্চনার তুঘলকী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে তাৎক্ষণিকভাবে ব্লক, মহকুমা ও জেলা সদরে এবং কলকাতার দপ্তরে দপ্তরে (Working place-এ) একাধিকবার টিফিনের সময় সহস্রাধিক কর্মচারীদের নিয়ে বিক্ষোভ, পে-কমিশন দপ্তর অভিযান ও সরকারের নগ্ন আক্রমণকে পরোয়া না করে সংগ্রামী মেজাজে সাহসের সাথে স্টীলের ব্যারিকেড ভাঙা, নবান্নতে সভা না করার সিদ্ধান্তে প্রতিবাদ জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়া এবং পরবর্তীতে নবান্নতে সাধারণ সম্পাদক ও যুগ্ম-সম্পাদকের উপস্থিতিতে বিক্ষোভ, রাজ্যপালের কাছে ডেপুটেশন, দু'দিন ধরে সারাদিন ব্যাজ পরিধান ও ১.৩০ মিনিট থেকে ২.৩০ মিনিট এক ঘণ্টা সারা রাজ্য জুড়েই বিক্ষোভ দারুণ সাড়া ফেলেছে কর্মচারীদের মধ্যে প্রশাসনের অভ্যন্তরে। সংগঠনের ধারাবাহিকভাবে একাধিক কর্মসূচীর সাফল্য কর্মচারীর মনোজগতে আস্থা, মনোবল, সাহস বৃদ্ধি করতে পেরেছে। ধারাবাহিকভাবে কর্মসূচীগুলিতে ব্যাপক অংশের কর্মচারীর অংশগ্রহণ যা সংগঠনকে আরো শক্তিশালী করতে এবং আগামী দিনে আরো তীব্র সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে অবশ্যই সহায়তা করবে।

এই সময় দাবি করছে, প্রশাসনের অভ্যন্তরে কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ করে 'অনেক হয়েছে' এই মনোভাব নিয়ে কর্মচারী বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আরো সক্রিয়ভাবে দৃঢ়তার সাথে গর্জে ওঠার। প্রশাসনে সর্বোচ্চ স্তর থেকে নিম্নস্তর পর্যন্ত ব্যাপক দুর্নীতি চলছে, সরকারী টাকা (জনগণের টাকা) স্বেচ্ছাচারের সাথে অনৈতিকভাবে বিলিবণ্টন চলছে, ব্যাপকহারে লুঠতরাজ চলছে সব স্তরেই। এরকম পরিস্থিতিতে আমরা কোনো অন্যায় দাবি করিনি, ন্যায্য দাবি আদায়ে লড়াই করছি। তাই কর্মচারীদের প্রাপ্য আর্থিক দাবি যা সারা ভারতবর্ষের রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা ভোগ করছে তা আমরা পাব না কেন? কর্মচারী তাঁর পরিবার সর্বোপরি সমাজে আমাদের সম্মান জড়িয়ে আছে। কেন ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হব? তাই কর্মচারীদের প্রাপ্য ন্যায্য দাবি ও সম্মানের প্রশ্নে আমাদের সংগঠন কোনোদিন কোনো হুমকির কাছে মাথা নত করেনি। যত আক্রমণ আসবে তত সংগঠন শক্তিশালী হবে, শুধু তাই নয়, আরো সাহসের সাথে আত্মত্যাগের মানসিকতা নিয়েই সরাসরি সংগ্রাম লড়াইয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নেবে।

২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের সন্ত্রাস ও গণতন্ত্রকে খুন করার পর সাধারণ মানুষ বলছে এর বেশি আর কী সন্ত্রাস দেখাবেন? আপনারা নরকের জীবদের পিঠে সওয়ার করছেন। তাদের পিঠ থেকে আর নামতে পারবেন না। যতদিন রাজনীতি করবেন ততদিন আরাবুল, অনুব্রতসহ সারা রাজ্যজুড়ে লুম্পেনদের পিঠে সওয়ার থাকতে হবে। নতুন কৌশল নেবার আর কোনো সুযোগ নেই। যতটা সন্ত্রাস করা যায় বা নোংরামো করা যায় নর্দমায় নেমে তা আপনারা করে ফেলেছেন বা দেখিয়ে দিয়েছেন রাজ্যের মানুষকে। কিন্তু প্রতিরোধ শুরু হয়েছে। শিক্ষাঙ্গনে, হাসপাতালে, পাড়ায় পাড়ায় সমাজের অভ্যন্তরে বীর ছাত্ররা দেখিয়ে দিয়েছে। চোখে চোখ রেখে কথা বলে। মাথা নত করতে বাধ্য করেছে নবান্নর ১৪ তলায় মহারানীকে। তাই সাবধান, প্রতিদিন তা বাড়ছে, আরো বাড়বে তো অবশ্যই, আরো তীব্র হবে। পৃথিবীর ইতিহাস তাই বলছে।

বর্তমানে রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা পাহাড় প্রমাণ আর্থিক বঞ্চনার শিকার। মুখ্যমন্ত্রী জানুয়ারি, ২০১৯ থেকে ১৮ শতাংশ মহার্ঘভাতা ও ১০ শতাংশ ইন্টোরিম রিলিফ মহার্ঘভাতায় কনভার্ট করে ৭ শতাংশ দেখিয়ে ১২৫ শতাংশ মহার্ঘভাতা দিয়ে দিলাম বললেন। আর্থিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছেন। ভূ-ভারতে এমন কোথাও ঘটেনি। চরম আর্থিক প্রতারণামূলক ঘোষণা—মহার্ঘভাতা জানুয়ারি'১৯-এ যখন পাব, তখন কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ২ কিস্তি মহার্ঘভাতা ঘোষণা হয়ে যাবে। অর্থাৎ আমরা যে তিমিরে আছি সেই তিমিরেই থাকবো। পে-কমিশন সঠিক সময়ে ঘোষণা না হওয়ায় ১০ শতাংশ অন্তর্বর্তীকালীন ভাতা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। তাকে মহার্ঘভাতায় ৭ শতাংশতে কনভার্ট করা মানে কর্মচারীদের বেতন কমে যাবে। এক অদ্ভুত ঘোষণা।

এদিকে সরকার বলছে রাজস্ব সংগ্রহ ১০০ শতাংশ ছাড়িয়ে ২০০, ৩০০ শতাংশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাহলে কর্মচারীদের ৪৯ শতাংশ মহার্ঘভাতা বকেয়া রাখা হচ্ছে কেন? ২০১১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের আগে নির্বাচনী ইস্তাহারে অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এখন তা বেলুনের মতো ফেটে পড়েছে। বর্তমান সরকার ও বামফ্রন্ট সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর তফাৎ রাজ্যের মানুষ যেমন বুঝতে পারছেন কর্মচারী সমাজও হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছেন। এখন কর্মচারী মহলে প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে ৬ষ্ঠ বেতন কমিশন কী হবে? আদৌ কি তা সূর্যের আলো দেখবে, না তা ডিপ ফ্রিজে ঢুকে গেল।

শুধুমাত্র সর্বস্তরের কর্মচারীদের সাধারণ দাবিগুলিই উপেক্ষিত হচ্ছে তা নয়, একান্ত মানবিক বিষয়গুলিও গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে না। যেমন, প্রায় দু'বছর হতে চললো মারা গেছেন স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মচারী কাজল ব্যানার্জী। সংগঠনের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্যভবনে ডেপুটেশন চলাকালিন সাধারণ প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসন একযোগে এমন এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, যার জেরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান কাজল ব্যানার্জী। অথচ আজও তাঁর স্ত্রীর চাকরির কোনো ব্যবস্থা হলো না। এই প্রশ্নে বার বার রাজ্যের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী শ্রীপার্থ চট্টোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্ত্বেও কোনো ফল হয়নি।

বর্তমান বিশ্বায়ন, বেসরকারীকরণ ও উদারীকরণের নামে সারা বিশ্বে, আমাদের দেশে ও রাজ্যে শ্রমজীবী মানুষের আর্থিক ও অধিকারগত সুযোগ সুবিধা হরণের লক্ষ্যে দেশের আর এস এস পরিচালিত বিজেপি সরকার একের পর এক স্বৈরাচারী পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে। আপাদমস্তক নয়া উদারনীতির সমর্থক রাজ্য সরকারও একই পথ অনুসরণ করছে। প্রশাসনের অভ্যন্তরে কর্মচারী জীবনে ও শ্রমজীবী মানুষের জীবন জীবিকায় যা ভয়ঙ্কর প্রভাব ফেলেছে। অর্থনৈতিক আক্রমণের পাশাপাশি গোটা দেশজুড়েই ধর্মীয় বিভাজনের মাধ্যমে সামাজিক অস্থিরতা তৈরি করা হচ্ছে। সর্বশেষ আসামের নাগরিক পঞ্জী প্রকাশকে কেন্দ্র করে যেসমস্ত ঘটনা ঘটছে, তা পরিস্থিতির অস্থিরতাকে আরও বৃদ্ধি করছে।

তাই রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির আহ্বানে বকেয়া ৪৯ শতাংশ মহার্ঘভাতা অবিলম্বে প্রদান, ৬ষ্ঠ বেতন কমিশন দ্রুত চালু করা, চুক্তি প্রথায় কর্মচারীদের সমকাজে সমবেতন ও নিয়মিত কর্মচারীদের মতো সুযোগ সুবিধা প্রদান, লক্ষাধিক শূন্যপদ পূরণ রাজ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষাসহ ৫ দফা দাবিতে আগামী ৩০ আগস্ট, ২০১৮ ছুটির পর ধর্মতলায় লেনিন মূর্তির পাদদেশে জমায়েত ও শিয়ালদহ স্টেশন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় মহামিছিল এবং রাজ্য জুড়ে প্রতিটি জেলা সদরে কর্মচারী সমাজের আত্মসম্মানের প্রশ্নে মহামিছিলে দৃপ্ত কণ্ঠে শামিল হওয়ার লক্ষ্যে সর্বত্র প্রস্তুতি গড়ে তুলুন। □

৭২তম স্বাধীনতা দিবসে টি জি ই এ (ত্রিপুরা সরকারী কর্মচারী সমিতি) ধর্মনগর বিভাগীয় দপ্তর গৈরিক সন্ত্রাসের সাক্ষী

স্বাধীনতার পর ত্রিপুরা রাজ্যে কোনো সরকারী-বেসরকারী-আধাসরকারী শিক্ষক-কর্মচারী সংগঠনের কোনো অফিস প্রশাসনের নাকের ডগায় প্রকাশ্যে এভাবে বলপূর্বক জবর দখল ত্রিপুরার মানুষের দেখার সুযোগ হয়নি।

এই অফিস বাড়ির জায়গা ত্রিপুরা সরকার, রেজিস্টার্ড লিজ ডিড করে টি জি ই এ-কে হস্তান্তর করেছে। টি জি ই এ লিজ ডিড-এ বর্ণিত সমস্ত শর্ত পূরণ করে প্রতি বছর লিজ প্রিমিয়াম প্রদান করে যাচ্ছে। লিজ ডকুমেন্ট ও খাজনার রসিদও রয়েছে।

টি জি ই এ-র সদস্যরা নিজেদের কাছ থেকে তহবিল সংগ্রহ করে এই অফিস বাড়ি নির্মাণ করেছেন। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, শিক্ষক কর্মচারী আন্দোলনের বরিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রয়াত ভুবনেশ্বর দে, অশেষ দেবরায়, প্রয়াত সঞ্জয় দেসহ অন্যান্য শিক্ষক-কর্মচারী নেতৃত্বের উপস্থিতিতে উক্ত অফিস বাড়ির উদ্বোধন করেছিলেন।

সংগঠন দপ্তর ঃ দখলের আগে (ওপরে); দখলের পরে (নিচে)

কাদের জন্য স্বাধীনতা?

কোথায় গণতন্ত্র?

এরাজ্যে শিক্ষক-কর্মচারীদের সমিতি সংগঠন করার কোনো অধিকার থাকবে না?

কেন হাতুড়ির আঘাতে আঘাতে শিলান্যাস এবং উদ্বোধনের ফলক ভেঙে চুরমার করে দেয়া হলো?

"চলো পাল্টাই"—এই শ্লোগান দিয়ে ক্ষমতায় এসে সবার সব অধিকার কেড়ে নিতে হবে? রাজ্য মন্ত্রিসভায়, প্রশাসনে কিংবা রাজ্যসরকার পরিচালনায় যেসকল রাজনৈতিক দল রয়েছে তাদের মধ্যে শিরদাঁড়া উঁচু করে অন্যায়ের প্রতিবাদ করার মতো, মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য ইতিবাচক সাহসী ভূমিকা নেওয়ার মতো কি কেউ নেই?

টিজিইএ ধর্মনগর বিভাগীয় কমিটি তাদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার রক্ষার জন্য কোথায় যাবে?

এরও পূর্বে দু'বার ধর্মনগর থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে। কিন্তু কোনো প্রতিকার নেই। আরক্ষা প্রশাসন প্রাণশক্তি হাঁরিয়ে নির্জীব হয়ে গেছে। আরক্ষা প্রশাসনের প্রতি মানুষের বিশ্বাসের জায়গাটা আস্তে আস্তে দুর্বল হচ্ছে।

বিষয়গুলো নিয়ে দলমত নির্বিশেষে সবাই ভাবুন, বিচার করুন।

ইতিমধ্যে ভয়ভীতি প্রদর্শন হুমকী শুরু হয়ে গেছে।

আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফোরামে বিষয়টা নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। সবত্র দাবি উঠুক—

১। অবিলম্বে অপরাধীদের চিহ্নিত করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২। অফিস বাড়িটির যাবতীয় ক্ষতিপূরণ করতে হবে।

৩। অবিলম্বে অফিস বাড়িটি দখল মুক্ত করে, টি জি ই এ-ধর্মনগর বিভাগীয় কমিটির নিকট হস্তান্তরিত করতে হবে।

৪। শিক্ষক-কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার খর্ব করা চলবে না।

৫। শিক্ষক-কর্মচারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

৬। ধর্মনগরের সুস্থ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিনষ্ট করার সমস্তরকম চক্রান্ত প্রতিহত করতে হবে।

৭। রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের বিরুদ্ধে সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এগিয়ে আসুন। □

আলিপুরদুয়ার

গত ১৩ জুলাই ২০১৮ তারিখ দুপুরবেলা কুমারগ্রাম ব্লকের কামাক্ষাগুড়িতে অবস্থিত সরকারী কর্মচারীদের সংগঠন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সমিতি দপ্তরটি তৃণমূল কংগ্রেস রাজনৈতিক দলের যুব শাখার কর্মীরা বলপূর্বক তালা ভেঙে দখল করে এবং দপ্তরের বাইরে উক্ত রাজনৈতিক দলের পতাকা ফেস্টুন লাগিয়ে দেয়।

উক্তবস্থায় সংগঠন মাননীয় ডি.এম ও এস.পি, আই.সি কুমারগ্রাম থানা, বি.ডি.ও কুমারগ্রাম ব্লকে সমস্ত ঘটনা উল্লেখ করে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছে। কিন্তু প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

ইতোমধ্যে ঐ দপ্তরের বাইরে 'তৃণমূল যুব কংগ্রেস কার্যালয়, কুমারগ্রাম ব্লক লিখে সাইনবোর্ড লাগানো হয়েছে এবং দপ্তরের ভেতরে ও বাইরে রং করে ১৫ আগস্ট, ২০১৮ তারিখে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে স্বাধীনতা দিবস পালন করেছে।

কর্মচারীদের অর্থে তৈরি প্রায় চল্লিশ বছরের পুরনো এই দপ্তরটি এই ভাবে দখল করে নেওয়ার ঘটনায় সংগঠন তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে এবং অবিলম্বে সমিতি দপ্তর দখল মুক্ত করাসহ দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রশাসনের নিকট দাবি জানাচ্ছি। □

চতুর্থ পৃষ্ঠার পর

মোদি সরকারের চার বছর

জোট নিরপেক্ষতার পথ থেকে মার্কিন অভিমুখী হয়েছে। বিগত আড়াই দশক ধরে কেন্দ্রের কংগ্রেস ও বিজেপি পরিচালিত সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে স্ট্র্যাটেজিক মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। নরেন্দ্র মোদির সরকারের শাসনকালে বিদেশনীতি আরও মার্কিনমুখী হয়েছে। মার্কিন চাপে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সর্বশেষ জোট নিরপেক্ষ শীর্ষসম্মেলনে যোগ দেননি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ভারতের যে লজিস্টিক এক্সচেঞ্জ মেমোর‍্যান্ডাম অফ এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষরিত হয়েছে, এই চুক্তির পথ ধরে ভারতে বিদেশী সামরিক ঘাঁটি স্থাপিত হতে পারে। মোদি সরকারের চার বছরের শাসনকালে ইস্রায়েলের সাথে ভারতের সম্পর্ক যেমন ঘনিষ্ঠ হয়েছে, তেমনই আমাদের দেশের দীর্ঘকালের মিত্র প্যালেস্টিনীয়দের সাথে সম্পর্কের ঘোর অবনতি ঘটেছে। এক কথায় বলা চলে যে, নরেন্দ্র মোদির সরকার অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যেমন চরম দক্ষিণপন্থী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, তেমনই একইভাবে বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রেও গ্রহণ করে চলেছে চরম মার্কিনমুখী নীতি।

পাঁচ

পূর্বোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে একথা বলা চলে যে, দেশের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব রক্ষায়, হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শের বিরুদ্ধে, গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় এবং স্বাধীন বিদেশনীতি রক্ষার জন্য অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, মতাদর্শগত এবং সাংস্কৃতিক স্তরে দেশব্যাপী ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন সঠিক মতাদর্শ, সঠিক রাজনীতি এবং ইস্পাতদৃঢ় সংগঠন। এই লক্ষ্যে আমাদের অগ্রসর হতে হবে। □

ছবিতে সংগঠন-আন্দোলন

মালদা জেলায় পেনশনার্স সমিতির ডেপুটেশন কর্মসূচী

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় পেনশনার্স সমিতির ডেপুটেশন কর্মসূচী

বর্ধমান জেলায় সংগ্রামী হাতিয়ার নিয়ে পাঠচক্র

উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় আলোচনা সভা
বিষয়ঃ স্বাধীনতা উত্তরকালে কর্মচারী আন্দোলনের গতি প্রকৃতি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রাজ্য কাউন্সিলের আহ্বান

সর্বভারতীয় ফেডারেশন ও ট্রেড ইউনিয়নগুলির আহ্বানে দিল্লীতে পার্লামেন্ট অভিযানের কর্মসূচী হবে। সেই কর্মসূচীতে সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের আহ্বানে আমাদের সংগঠনের নেতৃত্বরাও উপস্থিত থাকবেন। ৫ সেপ্টেম্বরের কর্মসূচীর পরবর্তীতে আগামী দিনের লড়াই-আন্দোলনের কর্মসূচী গৃহীত হবে।

বিগত কর্মসূচীর পর্যালোচনা করতে গিয়ে সাধারণ সম্পাদক বলেন, আর্থিক ও অধিকারগত দাবিসনদ নিয়ে মাননীয় রাজ্যপালের দপ্তরে বিগত ২৯ মার্চ ২০১৮ গুরুত্বপূর্ণ ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ৫-৮ এপ্রিল, ২০১৮ তামিলনাড়ু রাজ্যের চেন্নাই শহরে সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের ষোড়শ জাতীয় সম্মেলন সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবসের কর্মসূচী ১ মে বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে গুরুত্ব সহকারে যথোচিত মর্যাদায় কেন্দ্রীয়ভাবে কর্মচারী ভবনে, জেলা ও সমিতিগুলির দপ্তরে ঐতিহ্য অনুযায়ী সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬৮ সালের ১৬ মে সংগঠিত রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের প্রথম ধর্মঘটের ৫০ বছর পূর্তিতে কলকাতায় মৌলালী যুবকেন্দ্রে কেন্দ্রীয়ভাবে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে ধর্মঘটের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে জেলাগুলিতে ও কলকাতার ৩টি অঞ্চলে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে সাফল্যের সাথে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর্যালোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, নির্বাচন প্রক্রিয়ার সূচনা থেকে নির্বাচনের গণনা পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রেই আক্রমণ সংগঠিত করা হয়েছে, এক কথায় পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। নির্বাচনী কাজ পরিচালনা করা কালীন শিক্ষক মহাশয় রাজকুমার রায়কে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। এর প্রতিবাদে ১২ই জুলাই কমিটির আহ্বানে ও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির উদ্যোগে বিগত ২২ মে সারা রাজ্যজুড়ে টিফিনের সময় ঘৃণাভরে ধিক্কার জানিয়ে বিক্ষোভের কর্মসূচী সংগঠিত হয়েছে। বিগত ২৩ মে সর্বভারতীয় ফেডারেশন ও ট্রেড ইউনিয়নগুলির আহ্বানে বি.পি.এম.ও-র উদ্যোগে সর্বভারতীয় ১৭ দফা দাবী ও রাজ্যের দু'দফাসহ মোট ১৯ দফা দাবি নিয়ে কলকাতার রামলীলা ময়দানে 'গণ কনভেনশন' সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের আহ্বানে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির উদ্যোগে সর্বভারতীয় ৫ দফা ও রাজ্যের ৩ দফা দাবিসহ সর্বমোট ৮ দফা দাবিতে জাতীয় প্রতিবাদ দিবস উপলক্ষে সারা রাজ্যজুড়ে টিফিনের সময় দপ্তরে দপ্তরে বিক্ষোভ ও ছুটির পর কেন্দ্রীয়ভাবে কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল হলে প্রতিবাদ সভা সংগঠিত হয়। সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ও বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডঃ অসীম দাশগুপ্ত। মহার্ঘভাতা ও অন্তর্বর্তীকালীন ভাতা নিয়ে আর্থিক প্রতারণামূলক মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা এবং ষষ্ঠ বেতন কমিশন অনিশ্চিত জায়গায় ঠেলে দেওয়ার প্রতিবাদে কলকাতাসহ গোটা রাজ্যজুড়ে টিফিনের সময় বিক্ষোভ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়।

বিগত ২৬-২৭ জুন ২০১৮ বকেয়া মহার্ঘভাতা, পে-কমিশনের সুপারিশ, অবিলম্বে প্রকাশ ও চালু করাসহ ৫ দফা দাবিতে সারা রাজ্য জুড়ে প্রতিটি দপ্তরে সারাদিন ব্যাজ পরিধান ও টিফিনের সময় ১ ঘণ্টাব্যাপী বিক্ষোভ অবস্থানের কর্মসূচীর পর্যালোচনা প্রসঙ্গে সাধারণ সম্পাদক বলেন, এ সময়কালে এই কর্মসূচীর সফলতা নজরকাড়া। কিন্তু আত্মসন্তুষ্ট না হয়ে সাংগঠনিক পর্যালোচনার প্রয়োজন সমস্ত কর্মচারীর কাছে আমরা এই কর্মসূচীকে নিয়ে যেতে পেরেছিলাম কিনা, সমস্ত দপ্তরে আমরা এই কর্মসূচীকে প্রতিপালন করতে পারলাম কিনা। লাগাতার কর্মসূচীর মধ্যে সংগঠনের কর্মী নেতৃত্বরা সংগঠনকে শক্তিশালী করার প্রয়াস নিচ্ছেন, কিন্তু তার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা প্রয়োজন। ত্রুটি-ঘাটতিকে চিহ্নিত করে তা কাটানোর উদ্যোগ গ্রহণের সাথে সাথে সাফল্যকে সংহত করে এগোতে হবে পরিস্থিতিকে ভেদ করার লক্ষ্যে। কর্মসূচীর সফলতার মধ্য দিয়েই সংগঠনকে Build up করতে হবে। বিভিন্ন কর্মসূচী প্রতিপালন করতে গিয়ে পুলিশি বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে সংগঠনের কর্মী নেতৃত্বকে। একে প্রতিহত করেই প্রতিবাদ কর্মসূচী প্রতিপালন করতে হবে। ১২ই জুলাই কমিটির প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে কলকাতায় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় শতবার্ষিকী হলে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়, প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অনুনয় চট্টোপাধ্যায়।

আগামী কর্মসূচী প্রসঙ্গে তিনি বলেন বিগত কর্মসূচীগুলির সাফল্যকে সংহত করেই পত্রপত্রিকার গ্রাহকভুক্তিকরণ, সদস্য সংগ্রহ অভিযানসহ আগামী দিনে পরিস্থিতি মোকাবিলায় আরো বৃহত্তর সংগ্রামের লক্ষ্যে সর্বত্র প্রস্তুতি নিতে হবে। এ সময়কালে বিভিন্ন সমিতি, জেলা, অঞ্চলগুলিতে ইতিমধ্যে রক্তদান ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং রক্তদান শিবিরগুলিতে সহস্রাধিক রক্তদাতা রক্তদানে অংশগ্রহণ করেছেন যা অভিনন্দনযোগ্য। যে সমস্ত সমিতি, জেলা, অঞ্চল এখনও উক্ত কর্মসূচী প্রতিপালন করতে পারেননি, তাদের উদ্যোগ নিতে হবে। বিভিন্ন সমিতি এসময়কালে নিজস্ব দাবিদাওয়া নিয়ে কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন, যারা করেননি তাদের গুরুত্ব দিয়ে কর্মসূচী করার উদ্যোগ নিতে হবে।

সাংগঠনিক করণীয় বিষয় সম্পর্কে তিনি বলেন সংগঠনের সর্বনিম্ন স্তর ব্লক থেকে মহকুমা-জেলা সংগঠন পর্যন্ত প্রতিটি স্তরকে সচল রাখার প্রশ্নে ধারাবাহিক ব্লক-মহকুমা সফর করতে হবে। সমিতি এবং জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বকে একযোগে কাজে নামতে হবে। সর্বোচ্চ নেতৃত্বকে সর্বনিম্ন স্তরে নেমে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই কো-অর্ডিনেশন কমিটির সংগঠন তহবিল সংগ্রহ অভিযানসহ সদস্যভুক্তির কাজ সমাপ্ত করতে হবে।

আন্দোলনের কর্মসূচী প্রসঙ্গে সাধারণ সম্পাদক বলেন আগামী ৩০ আগস্ট ২০১৮ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির উদ্যোগে ও সহযোগী ৩টি সংগঠনকে যুক্ত করে বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদান, বেতন কমিশন দ্রুত প্রকাশ ও চালু করাসহ ৫ দফা দাবিতে কলকাতায় কেন্দ্রীয় মহামিছিল অনুষ্ঠিত হবে। জেলাগুলিতেও অনুরূপভাবে একই দিনে জেলা সদরে মিছিল সংগঠিত করতে হবে।

আগামী ১১ আগস্ট, ২০১৮ কেন্দ্রীয়ভাবে সাংস্কৃতিক কর্মসূচী মৌলালী যুবকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। ৮-৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ রাজ্য মহিলা কনভেনশন কর্মচারী ভবনে অরবিন্দ সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত কনভেনশনে জেলা থেকে ৪ জন, অন্তর্ভুক্ত সমিতি ও অঞ্চলগুলি থেকে ৩ জন করে মহিলানেত্রী উপস্থিত থাকবেন। আগামী ২২-২৩ ডিসেম্বর, ২০১৮ সর্বভারতীয় সংগঠনের আহ্বানে জাতীয় মহিলা কনভেনশন মহারাষ্ট্রের নাগপুরে অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত কনভেনশনে আমাদের রাজ্য থেকে মহিলা প্রতিনিধি উপস্থিত থাকবেন। এছাড়াও আগামীতে অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি সমিতির রাজ্য সম্মেলন ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত হবে। রাজ্য সম্মেলনকে সফল করার প্রাক প্রস্তুতি স্বরূপ ব্লক মহকুমা ও জেলা সম্মেলনগুলিকে সফল করার লক্ষ্যে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

সাধারণ সম্পাদকের প্রস্তাবনার পরবর্তীতে ১৯টি জেলা, ৭টি অঞ্চল এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতির পক্ষ থেকে আলোচনা করতে গিয়ে ২৭ জন বক্তা তাদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সংগঠনকে আরও গতিশীল করার প্রশ্নে তাদের মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেন।

সমগ্র আলোচনাকে সূত্রায়িত করে জবাবী বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী বলেন সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তা রূপায়ণের প্রশ্নে অগ্রগতি ঘটলেও, আত্মসন্তুষ্ট না হয়ে আগামী সমস্ত কর্মসূচীকে সফলভাবে রূপায়নের প্রশ্নে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। কর্মচারী সংগঠন পরিচালনার প্রশ্নে আজকে বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধকতা তৈরি হচ্ছে। ২০১১ পরবর্তীতে আজকে সন্ত্রাস-আক্রমণের তীব্রতা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, অপরদিকে মেরুকরণের রাজনীতিকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে দেশের শাসকদল মিডিয়াকে অর্থের দ্বারা প্রভাবিত করছে। ধর্মের ভিত্তিতে মেরুকরণ এবং হিন্দুত্বকে প্রাসঙ্গিক করার জন্য সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করা হচ্ছে। রাজ্যের বর্তমান শাসকদলও এই ধর্মীয় মেরুকরণকে উৎসাহিত করছে। বর্তমান রাজ্য সরকার ব্যয় সঙ্কোচনের নামে কর্মী সঙ্কোচন করতে চাইছে। পে কমিশন মহার্ঘভাতা বকেয়া অপরদিকে মেদবিহীন প্রশাসনের লক্ষ্যে কর্মী সংখ্যা হ্রাসের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক লড়াই আন্দোলনই একমাত্র পথ। এই লক্ষ্যেই আগামী ৩০ আগস্টের মহামিছিলকে আমাদের দেখতে হবে। মতাদর্শগত চর্চাকে আরও বৃদ্ধি করার মধ্য দিয়েই পরিস্থিতির নেতিবাচক উপাদান থেকে সদস্য কর্মী বন্ধুসহ সার্বিক সংগঠনকে আরও মজবুত করে গড়ে তুলতে হবে। দাবি অর্জিত হলেও আজ তাকে সুরক্ষিত রাখার প্রশ্নে কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। তহবিল সংগ্রহ অভিযানের ক্ষেত্রে এখনও যেখানে কিছু সদস্য বন্ধু বাদ পড়ে রয়েছেন তাদের কাছে দ্রুততার সঙ্গে পৌঁছাতে হবে। বকেয়া মহার্ঘভাতা সহ পে-কমিশন বিষয়ে আইনী লড়াইয়ের প্রশ্নে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি বিশ্বাস করে সাংগঠনিক পূর্বসূরীরা লড়াই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই এই দাবি অর্জন করেছিলেন আজকে ধারাবাহিক লড়াই- আন্দোলন-সংগ্রামই দাবি অর্জনের একমাত্র পথ।

সমস্ত আলোচনাকে উপস্থিত কাউন্সিল সদস্যরা গ্রহণের পরবর্তীতে সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষে অসিত কুমার ভট্টাচার্য সভার সমাপ্তি ঘোষণা করতে গিয়ে বলেন, বর্তমান প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কর্মসূচীকে সর্বাত্মক সফল করতে গেলে চিন্তার ঐক্য - ইচ্ছার ঐক্য - কাজের ঐক্য হলেই শুধু হবে না, রূপায়ণের ক্ষেত্রেও ঐক্যের প্রয়োজন। নেতিবাচক পরিস্থিতির ইতিবাচক উপাদানগুলিকে সাংগঠনিক কাঠামোয় ব্যবহারের প্রশ্নে মতাদর্শে অবিচল থেকে ঐক্যবদ্ধভাবে আসুন আমরা আগামীর লড়াই সংগ্রামে শামিল হই। □

দেবাশীষ রায়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জেল ভরো আন্দোলন

সামাজিক সংগঠন। কেন্দ্রের মোদি সরকারকে স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিয়ে দেশের রাজপথে রাজপথে এদিন তাই নেমে এসেছিলেন লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবি মানুষ।

সারাভারত কৃষকসভার ডাকে ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ও ঋণ মকুবের দাবিসহ কৃষক, ক্ষেত মজুরদের অন্যান্য দাবিতে পশ্চিমবঙ্গ জুড়েও জেল ভরো আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন লক্ষাধিক মানুষ। মূলত মোদি সরকারের বিরুদ্ধে 'জেল ভরো' আন্দোলনকে আনুষ্ঠানিক গ্রেপ্তারের মাধ্যমে স্বীকৃতি দানে তৃণমূল সরকারের পুলিশ অনীহা দেখিয়েছে। প্রশাসনিক ভবনগুলির কিছুটা দূরে পুলিশ ব্যারিকেড করে বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়া আইন অমান্যকারীরা প্রায় সবক্ষেত্রেই ব্যারিকেড ভেঙে ভবনগুলির ভিতরে প্রবেশ করে। পুলিশের আক্রমণে রক্তাক্ত হয়েছেন তাঁরা কিন্তু সংগ্রাম থেকে কেউ সরে যাননি। উল্টে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন যে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে তৃণমূল সরকারের পুলিশের এত রাগ কেন?

কৃষক ও ক্ষেত মজুরদের কেন্দ্রীয় দাবিগুলি— (১) গরীব কৃষক ও কৃষি মজুরদের সমস্ত ধরনের ঋণ থেকে মুক্তি। (২) উৎপাদন ব্যয়ের দেড়গুণ ন্যুনতম সহায়ক মূল্য নির্ধারণের আইনী নিশ্চয়তা। (৩) কৃষকের নামে জমির মালিকানা দ্রুত প্রদান। (৪) অরণ্যের অধিকার আইন কার্যকরী করা। (৫) কৃষি মজুর, গরীব ও মধ্যবিত্ত কৃষকদের জন্য প্রতিমাসে ৫,০০০ টাকা পেনশন প্রদান। (৬) একটি সুসংহত শস্যবীমা প্রকল্প কার্যকরী করা। □

আলোচনা সভা

ওয়েস্ট বেঙ্গল নন্-মেডিক্যাল টেকনিক্যাল এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের উদ্যোগে ৪র্থ বর্ষ কমরেড সত্য ভট্টাচার্য স্মারক বক্তৃতা গত ২৩ জুন ২০১৮ সংগঠন দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়। স্মারক বক্তৃতার বিষয় ছিল 'আক্রান্ত গণতন্ত্র- প্রতিরোধের পথ"। আলোচনা করেন ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের সর্ব ভারতীয় যুগ্ম সম্পাদক দেবজ্যোতি দাস। কর্মসূচীতে সভাপতিত্ব করেন সমিতির অন্যতম সহ-সভাপতি মানস কুমার বড়ুয়া। সভায় বিভিন্ন সংগ্রামী সংগঠনের নেতৃত্ব সহ প্রায় ৭০ জন কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। □

আন্দোলনের সাফল্য

ওয়েস্ট বেঙ্গল সার্ভে এ্যান্ড ড্রইং এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশনের অন্তর্ভুক্ত সার্ভেয়ার কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারের নিয়োগনীতি অনুযায়ী আই টি আই বা স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে ২ বছরের সার্টিফিকেট কোর্স সম্পন্ন করে চাকুরিতে প্রবেশ করতে হয়।

২০১৫ সাল থেকে সমস্ত আই টি আইগুলিতে সার্ভেয়ারশীপ কোর্স ২ বছরের জায়গায় ১ বছরের জন্য চালু করা হয়। যার ফলে সরকারী নিয়োগনীতি অনুযায়ী যারা ১ বছরের কোর্স সম্পন্ন করবেন তারা কোথাও চাকুরি পাবেন না।

এই সমস্যাটি সমিতির নজরে আসার সাথে সাথে ওয়েস্ট বেঙ্গল সার্ভে এ্যান্ড ড্রইং এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে এবং কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রীকে প্রথম দফায় ডিসেম্বর ২০১৭ এবং দ্বিতীয় দফায় মার্চ ২০১৮ এক বছরের সার্ভেয়ারশীপ কোর্স পুনরায় ২ বছরের কোর্সে প্রবর্তনের দাবি জানিয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়।

আনন্দের কথা, সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে সংগঠনকে চিঠি দিয়ে আমাদের পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করে, এবং সার্ভেয়ারশীপ কোর্স ২০১৮ সাল থেকে পুনরায় ২ বছরের কোর্সে প্রবর্তন করার সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে। □

রক্তদান কর্মসূচী

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি নদীয়া জেলার পক্ষ থেকে ৫ আগস্ট ১৮, রবিবার পরিবার পরিজনসহ বিপুল কর্মচারীর উপস্থিতিতে রক্তদানের কর্মসূচী কৃষ্ণনগর সমিতিভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ সমীর চৌধুরী এই রক্তদানের কর্মসূচী উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি শান্তনু ব্যানার্জী এবং প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন নদীয়া জেলার সম্পাদক তিমির বিশ্বাস। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য অনুসারে এবং বর্তমান সামাজিক বাস্তবতার ওপর দাঁড়িয়ে এই রক্তদানের কর্মসূচী মতাদর্শগত চর্চাকে বিস্তৃত করবে এই আশা প্রকাশ করেছেন আজকের কর্মসূচীর মাননীয় উদ্বোধক। পরিবার-পরিজনসহ মোট ৫০ জন রক্তদাতা রক্তদান করেছেন। □

আলোচনা সভা

প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরেও ৮ জুলাই '২০১৮ তারিখে **রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, নদীয়া জেলা কমিটির** উদ্যোগে জেলা সংগঠন দপ্তরে সাংস্কৃতিক কর্মসূচী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথমেই "সমসাময়িক কাল ও রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত চর্চা" শীর্ষক বিষয়ে আলোচনা করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিশ্বম্ভর মণ্ডল।

পরবর্তীতে সংগঠনের সাংস্কৃতিক টীমের পরিচালনায় সংগঠনের সদস্য ও পরিবার পরিজনদের নিয়ে গান, আবৃত্তি, শ্রুতি-নাটক ও সাংস্কৃতিক টিমের দ্বারা এক গীতি-আলেখ্য অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানটিতে ২৭ জন সদস্য ও পরিবার পরিজনদের পক্ষ থেকে অংশ নেন এবং সমগ্র অনুষ্ঠানে মোট ১২৫ জন উপস্থিত ছিলেন। □

ডেপুটেশনের কর্মসূচী

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনারস সমিতি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা জমায়েত ও জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশনের কর্মসূচী ১০ আগস্ট আলিপুর পোস্ট অফিসের সামনে অনুষ্ঠিত হয়। বকেয়া ডিএ প্রদান, পে কমিশন কার্যকরী করা, হেলথ স্কীম-এর সুযোগ সরলীকরণ করা অহেতুক দেরি না করা, সকলের বেকারের কাজ ও সমকাজে সম বেতনের দাবিতে এই কর্মসূচীতে ৪০০-র বেশি অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন শ্যামাপ্রসাদ রায়। প্রস্তাব পেশ করেন জেলার যুগ্ম সম্পাদক গোপাল চ্যাটার্জী। প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক পিনাকী বাগচী, ১২ই জুলাই কমিটির জেলার অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক সুষ চক্রবর্তী ও কেন্দ্রীয় পেনশনার সমিতির নেতৃত্ব লক্ষী কান্ত ঘোষাল। অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সম্পাদক অঞ্জন বসু। আগামী ৩০ আগস্ট সমস্ত জেলা সহ কলকাতায় ধর্মতলা থেকে শিয়ালদা মহামিছিলের কর্মসূচী সফল করার জন্য আহ্বান জানানো হয়। □

গণডেপুটেশন কর্মসূচী

পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ কর্মচারী সমিতির উদ্যোগে ২১-৮-২০১৮ তারিখ, মঙ্গলবার দুপুর ১-৩০ মিনিটে বিভাগের কর্মচারীদের নানা দাবিতে বিভাগীয় কমিশনারের কাছে গণডেপুটেশনের কর্মসূচী প্রতিপালিত হয়। গণডেপুটেশনের এই কর্মসূচীতে কলকাতার কর্মচারীরা ছাড়াও হাওড়া, হুগলী, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা থেকেও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। গণডেপুটেশনের এই কর্মসূচীতে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভানেত্রী পৌষালী সরকার। প্রায় দু'শতাধিক কর্মচারীর উপস্থিতিতে এই সভায় বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য সুমিত ভট্টাচার্য্য ও পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ কর্মচারী সমিতির সাধারণ সম্পাদক উৎসর্গ মিত্র। বিভাগের সমস্ত শূন্যপদ পূরণ, নিয়মিত কর্মচারীদের পদোন্নতির তালিকা প্রকাশ, সুষ্ঠু বদলী নীতি প্রণয়ন, গ্রেডেশন লিস্ট আপডেট সহ মোট দশ দফা দাবি নিয়ে এদিনই বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করা হয় এবং জরুরী ভিত্তিতে এইসব বিষয়গুলির মীমাংসার দাবি জানানো হয়। বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ দাবিগুলির সাথে সহমত পোষণ করেছেন এবং দাবিগুলির দ্রুত নিষ্পত্তির আশ্বাস দিয়েছেন। সমিতির পক্ষ থেকে বিষয়গুলির উপর নজর রাখা হবে জানানো হয়েছে। □

প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন

১৯ শে আগস্ট ২০১৮, **পশ্চিমবঙ্গ সরকারী ড্রাইভার্স মেকানিক্যাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন**-এর ৩৪তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপিত হয়।

সমিতির ৩৪তম প্রতিষ্ঠা দিবস সমিতির কেন্দ্রীয় দপ্তরের নুটবিহারী কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি ছিতেশ্বর সিং। স্বপন মান্নার কবিতার পর অন্দোলনের অংশ হিসাবে ৯ দফা দাবিসহ দাবি প্রস্তাব পেশ করেন যুগ্ম সম্পাদক উৎপল রাজবংশী। সাধারণ সম্পাদক অর্জুন মান্না সমিতির প্রতিষ্ঠা দিবসের ইতিহাস ব্যাখ্যাসহ ৯ দফা দাবির সমর্থনে বক্তব্য রাখেন। সবশেষে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কোষাধ্যক্ষ লিটন পাণ্ডে বর্তমান সময়ে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সংগ্রাম-আন্দোলনের কথা তুলে ধরেন। কেরলের ভয়াবহ বন্যায় কেন্দ্রীয় সাহায্যের অপ্রতুলতা, রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের প্রতি সীমাহীন বঞ্চনা, কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের জনস্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ড ব্যাখ্যা করেন। আগামী ৩০ আগস্ট-এর মহামিছিলে সকলকে উপস্থিত থাকার জন্য আহ্বান জানিয়ে তিনি বক্তব্য শেষ করেন। □

গণ ডেপুটেশন কর্মসূচী

ওয়েস্ট বেঙ্গল ভেটেরিনারি ফার্মাসিস্টস্ এ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে গণডেপুটেশনের কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয় গত ২৯ জুন ২০১৮ প্রাণী সম্পদ ভবনে। এই কর্মসূচীতে দুই শতাধিক কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। সভা শুরু হওয়ার আগেই রাজ্য সরকারের পুলিশ বাহিনী প্রাণী সম্পদ ভবনটি ঘিরে ফেলে এবং উপস্থিত কর্মচারীদের জোর করে ক্যাম্পাসের বাইরে বের করে দেয়। ফলে রাস্তার ওপরেই সভা করতে হয়। এই সভায় বন্দনা ভট্টাচার্য, সুদীপ কুমার নন্দী ও দুলাল চন্দ্র বসাককে নিয়ে সভাপতিমণ্ডলী গঠন করা হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ সিংহ রায়, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্তচৌধুরী, সহ সভাপতি প্রশান্ত সাহা এবং কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য আশিস ভট্টাচার্য। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন লবণহ্রদ অঞ্চল কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক কল্যাণ রক্ষিত। এই গণ ডেপুটেশনের মূল দাবি ছিল— 'নির্বিচার বদলী নয়, আইন মেনে অপশনের ভিত্তিতে বদলী করতে হবে।' এই দাবি নিয়ে সমিতির সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে পাঁচ জনের একটি টিম অধিকর্তার নিকট ডেপুটেশন দেন। আন্দোলনের তাৎক্ষনিক সাফল্য হিসেবে ঐ দিনই সমিতির একজন নেতৃত্বকে নিয়ম মেনে বদলী করা সম্ভব হয়েছে। অধিকর্তা অতি দ্রুত বাৎসরিক বদলীর তালিকা প্রকাশের আশ্বাস দিয়েছেন। □

ফার্মাসিস্টস্ ডে

ওয়েস্ট বেঙ্গল ভেটেরিনারি ফার্মাসিস্টস্ এ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে গত ২৯ জুন ২০১৮ কলকাতার কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল হলে ফার্মাসিস্টস ডে উদ্‌যাপিত হয়। এই সভায় প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ সিংহ রায়। প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য আশিস ভট্টাচার্য। বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা করেন শ্রী সঞ্জয় কুমার নাথ। শ্রেষ্ঠ ফার্মাসিস্টসের পুরস্কার পান রনজিৎ কর্মকার ও সঞ্জয় কুমার নাথ। □

ওয়েস্ট বেঙ্গল ডেয়ারী ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড এ্যানিম্যাল হাসব্যান্ড্রী ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন

বিগত ৩০ এবং ৩১ ডিসেম্বর ওয়েস্ট বেঙ্গল ডেয়ারী ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড এ্যানিম্যাল হাসব্যান্ড্রী ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের দ্বা-বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন রক্তপতাকা উত্তোলন, উদ্বোধক সহ উপস্থিত নেতৃত্বের শহীদ-বেদীতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে রাজ্য সম্মেলন শুরু হয়, পরবর্তীতে সম্মেলন কক্ষে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক শাখা কয়েকটি উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করে দ্বা-বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন পরিচালনা করেন সংগঠনের সভাপতি অজিত ঘোষ এবং সহ-সভাপতিদ্বয় ভুবন দাস ও তপন বিশ্বাস এবং দীপক বিশ্বাসকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। পরবর্তীতে সভাপতিমণ্ডলী কর্তৃক শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষে কমরেড অজিত ঘোষ এবং নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে প্রয়াত নেতৃবৃন্দের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। দ্বা-বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি প্রদীপ মিত্র উপস্থিত প্রতিনিধিদের কাছে লিখিত ভাষণ পাঠ করেন। সম্মেলন আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র সংগ্রামী হাতিয়ার-এর সম্পাদক তথা কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুমিত ভট্টাচার্য ২২টি বৈদ্যুতিক বাতি প্রজ্জ্বলিত করে। এবং পরবর্তীতে তাঁর বক্তব্য রাখেন। সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন—পশ্চিমবঙ্গ দুগ্ধ সমবায় সমিতির সাধারণ সম্পাদক অভিজিৎ রায়। সম্মেলনের সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন উত্থাপন করেন সংগঠনের অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক সুকুমার বেরা, আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ অরূপ পাল।

সম্মেলনে ৯টি খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করেন সংগঠনের অন্যতম সহ-সম্পাদক সাধন দাস। সর্বভারতীয়, রাজ্যস্তরের এবং সমিতিগত দাবি প্রস্তাব উত্থাপন করেন কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য তাপস সেনগুপ্ত। সংগঠনের গঠনতন্ত্র সংশোধনীর প্রস্তাব উত্থাপন করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অভিজিৎ রায়চৌধুরী। প্রস্তাবগুচ্ছের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র দে। সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন, আয়-ব্যয়, খসড়া প্রস্তাবের উপর ১১টি ইউনিট থেকে ১৮ জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় দিন সম্মেলনের শুরুতে সমিতির প্রয়াত নেতৃত্ব, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুশীল পালের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনের উপস্থিত প্রতিনিধিদের হাজিরা পেশ করেন দপ্তর সম্পাদক পঙ্কজ ভদ্র। প্রতিনিধি, ভ্রাতৃপ্রতিম প্রতিনিধি, প্রাক্তন নেতৃত্ব, বিশেষ প্রতিনিধি, অভ্যর্থনা কমিটির সদস্য সহ ১৪২ জন উপস্থিত ছিলেন। ক্রেডেনশিয়াল রিপোর্ট পেশ করেন সাধন দাস। অভ্যর্থনা কমিটির কার্যকরী সভাপতি দেবশংকর সিন্‌হা মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। পরবর্তীতে অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক সাধন দাস বক্তব্য রাখেন। সম্মেলনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের কর্মসূচী ছিল সংগঠনের সদস্যদের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে উত্তীর্ণ পুত্র-কন্যা এবং অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ নেতৃবৃন্দের সম্বর্ধনা। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় ছাত্র ফেডারেশনের সহ-সভানেত্রী মধুজা সেনরায়।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অভিজিৎ রায়চৌধুরী তাঁর জবাবী বক্তব্য পেশ করেন। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন, আয় ও ব্যয়ের হিসাব, খসড়া প্রস্তাবাবলী, গঠনতন্ত্রের সংশোধনীর প্রস্তাব এবং সর্বসম্মতিক্রমে মাধ্যমে অনুমোদিত হয়।

সম্মেলন থেকে ৪৯ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি এবং ১৯ জনের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী নির্বাচিত হয়।

সভাপতি ঃ ভুবন দাস, **সাধারণ সম্পাদক ঃ** সুকুমার বেরা, **যুগ্ম সম্পাদক ঃ** নারায়ণ চন্দ্র দে, সাধন দাস, **কোষধ্যক্ষ ঃ** মনোজ রায়, **দপ্তর সম্পাদক ঃ** গৌতম বোস নির্বাচিত হন।

সবশেষে সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষে সভাপতি অজিত ঘোষ-এর সমাপ্তি বক্তব্য এবং আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সমিতির ২২তম রাজ্য সম্মেলন সমাপ্ত হয়। □

সমিতি সম্মেলন

অনিবার্য কারণবশত রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্তর্ভুক্ত কিছু সমিতির রাজ্য সম্মেলনের সংবাদ সংগ্রামী হাতিয়ারে প্রকাশ করা যায়নি। অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত। ঐ সমিতিগুলির রাজ্য সম্মেলনের রিপোর্ট এই সংখ্যায় প্রকাশিত হলো।

ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট ইলেকট্রিক্যাল এন্ড মেকানিক্যাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন

গত ৯-১০ ডিসেম্বর, ২০১৭, কলকাতার কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ভবনে, সংগঠনের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক প্রয়াত কমরেড কুমার রায় নামাঙ্কিত মঞ্চে, ২৭তম (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রক্ত পতাকা উত্তোলন ও শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সূচনা হয়। রক্ত পতাকা উত্তোলন করেন সমিতির কেন্দ্রীয় সভাপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরী। এরপর একে একে নেতৃবৃন্দ শহীদ বেদীতে মাল্যদান করে শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। সম্মেলন কক্ষে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক টিম। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি, ১২ই জুলাই কমিটির প্রাক্তন যুগ্ম আহ্বায়ক শিবশঙ্কর রায় স্বাগত ভাষণ দেন।

রাজ্য সম্মেলনের উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য বানীপ্রসাদ ব্যানার্জী। তিনি তাঁর উদ্বোধনী বক্তব্যে আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও রাজ্য পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সংগঠনের করণীয়গুলি ব্যাখ্যা করেন। সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন উত্থাপন করেন যুগ্ম-সম্পাদক অমল বিশ্বাস। আয়-ব্যয়ের প্রতিবেদন পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ শিবু ঘোষ। খসড়া প্রস্তাবাবলী উত্থাপন করেন অন্যতম সহ-সম্পাদক কানাই জানা, সমর্থনে বক্তব্য রাখেন অপর সহ-সম্পাদক বাসুদেব ঘোষ।

উত্থাপিত প্রতিবেদন, প্রস্তাবাবলী ও আয়-ব্যয়ের হিসেবের ওপর মোট ১৯ জন প্রতিনিধি আলোচনা করেন। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে স্বাগত ভাষণ দেন অভ্যর্থনা কমিটির কার্যকরী সভাপতি, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পূর্বাঞ্চলের সম্পাদক দেবশঙ্কর সিন্‌হা, প্রতিনিধিদের আলোচনার জবাবী ভাষণ দেন সাধারণ সম্পাদক পুরুষোত্তম যাদব।

সম্মেলন থেকে ৫৭ জনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি সহ ২১ জনের সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হয়।

নব নির্বাচিত পদাধিকারীরা হলেন--- পুরুষোত্তম যাদব --- **সভাপতি,** চন্দন সেন রায়--- **সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক ঃ** কানাই জানা, **কোষাধ্যক্ষ ঃ** শিবু ঘোষ, **দপ্তর সম্পাদক ঃ** প্রশান্ত মজুমদার। □

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী ড্রাইভার্স ও মেকানিক্যাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন

গত ১০-১১ মার্চ, ২০১৮ নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে অবস্থিত কর্মচারীভবনে এই সমিতির ষোড়শ রাজ্য সম্মেলন সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে। এই সম্মেলন পরিচালনা করেন কৃষ্ণপদ বিশ্বাস, গোপাল বণিক এবং তাপস সেন বক্সিকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। রক্তপতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সূচনা হয়। সম্মেলন উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক দেবব্রত রায়। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন যুগ্ম সম্মাদক গুরুপদ সরকার। আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ হরিপদ দাস। খসড়া প্রস্তাব পেশ করেন অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক উৎপল রাজবংশী। ১৭টি জেলার পক্ষ থেকে ১৯ জন খসড়া প্রতিবেদনসহ অন্যান্য বিষয়ের উপর আলোচনা করেন। আলোচনার শেষে জবাবী বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক অর্জুন মান্না।

সম্মেলনে মোট ১২৩ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ বুলেটিন প্রকাশ করেন উদ্বোধক দেবব্রত রায়। সম্মেলন থেকে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত পদাধিকারীবৃন্দ নির্বাচিত হন—

সভাপতি ঃ ছিত্বেশ্বর সিং, **সাধারণ সম্পাদক ঃ** অর্জুন মান্না, **যুগ্ম সম্মাদকদ্বয় ঃ** উৎপল রাজবংশী, কৃষ্ণকান্ত পাইন, **কোষাধ্যক্ষ ঃ** হরিপদ দাস, **দপ্তর সম্পাদক ঃ** উদয় মল্লিক। □

Editor : SUMIT BHATTACHARYA
SANGRAMI HATIAR

State Co-ordination Committee
47th Year, 3rd Issue, July '18

Regd. No. : 18484/71
Price : Two Rupees

কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

সম্পাদক ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
যোগাযোগ ঃ দূরভাষ-২২৬৪-৯৫৯৩, ২২৬৫-০৯২৬ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮
ই-মেল ঃ sangramihatiar@gmail.com
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক
১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক
সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কোঃ অপঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিঃ
১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত।